সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)

বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভান্ডারিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১১ সালে তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুসলেহউদ্দিন মিয়া।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা শেষে তিনি ভান্ডারিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিনি পিরোজপুর সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করার পর পিরোজপুর সিভিল কোর্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় মানিক মিয়া হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। ১৯৩৭ সালে তিনি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত গোয়ালন্দ গ্রামের খোন্দকার আবুল হাসান সাহেবের কন্যা মাজেদা বেগমকে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনে তাঁরা অত্যন্ত সুখী ছিলেন।

শহীদ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মানিক মিয়া তদানীন্তন বাংলা সরকারের বাংলা সরকারের বরিশাল জেলা জনসংযোগ অফিসার পদে যোগদান করেন এবং কোর্টের চাকুরী ছেড়ে দেন। এর কিছুকাল পর তিনি জনসংযোগ বিভাগের চাকরিতেও ইস্তফা দেন। শহীদ সাহেব মানিক মিয়াকে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে দৈনিক ইত্তেহাদ-এর পরিচালনা বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় তিনি ইত্তেহাদ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই দলের মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন-এর আনুষ্ঠানিক সম্পাদক। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে মানিক মিয়া এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শহীদ সাহেবের উৎসাহ ও সহযোগিতায় ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটায় এই ইত্তেফাক, বিশেষ করে 'মোসাফির'-এর কালজয়ী লেখনী। মানিক মিয়া 'মোসাফির' ছদ্মনামে ইত্তেফাকে রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখতেন।

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৬৩ সালে তিনি আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি কিছুকাল পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার-এর সেক্রেটারীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় দু'বছরকাল তিনি পিআইএ-এর ডিরেক্টরের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৫২ সালে তিনি এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে পাকিস্তানের অন্যতম সদস্য হিসবে চীন সফর করেন।

১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সামরিক আইন লংঘনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬২ সালের গণআন্দোলনের পটভূমিতে তাঁকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়। সর্বশেষ তাকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৬৬ সালেল ১৬ জুন এবং মুক্তিলাভ করেন ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইত্তেফাক-এর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশিত হয়। ঐ বছর ২৬ মে মানিক মিয়া ইত্তেফাকের প্রাতিষ্ঠানিক কাজে রাওয়ালপিন্ডি যান। সেখানে ১লা জুন আকস্মিকভাবে তার জীবনলীলার অবসান হয় (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)।

মানিক মিয়ার দুই পুত্র মইনুল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। দৈনিক ইত্তেফাক তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)

সম্পাদকীয় ঃ সৈয়দ তোশারফ আলী

মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২

মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮

ফ্যাক্স ঃ ০৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮৮

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ একুশে বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

নাসিম আহমেদ

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার

৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড

২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা- ১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

১৫০ টাকা মাত্র

ISBN

984-8613-02-1

Sangbadpattrayr Shadinata : Writer : Taffazal Hossain (Manik Miah)
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary,
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limitec
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম
কর্মীদের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ১১
সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৭
সংবাদপত্রের নীতি ও পরিচালনা ২৪
স্বাধীন সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজ ২৭
সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যা ৩৩
একটি অপূরণীয় ক্ষতি ৩৯
গণকল্যাণের রাজনীতি ৪১
সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব ৫১
বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা ৫৯
সার্বভৌম বাংলা থেকে গৃহযুদ্ধ ৬৫
যুবশক্তিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে ৬৮
গোটা জাতি দায়ী নয় ৭৭
সামরিক শাসনের স্বাভাবিক পরিণতি ৮০
স্তাবকতা প্রসঙ্গে ৮২
পরিবর্তিত পরিবেশ ৮৬
স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রনায়ক ৯০
ইতিহাসের মতন গতিশীল জীবনের দু'টি অধ্যায় ৯৪
বার বার কেবল একটি কথাই মনে পড়ে ১০৫
মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের উত্তরাধিকার ১১৫
সমুদ্রের পরিমাপ যেমন সম্ভব নয় ১২৩
লুমুম্বার হত্যা ও কঙ্গো পরিস্থিতি ১৩৫
পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যুতে ১৩৯
In Memory of Huseyn Shaheed Suhrawardy ১৪২
Developing Politics In Pakistan ১৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

দেশের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে আপনারা আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন দু'কথা বলার জন্য, যে ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে দিগ্বলয়ে তিমিরাবসানের প্রতীক্ষায় আমরা সকলেই অধীর এবং উদ্বিগ্ন। জানি না তিমির-বিদার ঊষার অভ্যুদয় আমরা দেখে যেতে পারব কিনা। কিন্তু আমি নিজে সূর্য-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। আপনাদেরও এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই সাংবাদিকতার মহান ব্রতে অটল থাকার জন্য অনুরোধ জানাই। এটা আমার প্রৌঢ়ত্বের অহমিকা নয়, বলা যেতে পারে, এটা আমার অভিজ্ঞান। যে অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আজ নিঃসংকোচে আমি একথা আপনাদের বলতে পারি যে, এ পেশায় স্বাচ্ছন্দ্য নেই সত্য, সন্তোষ আছে; স্বস্তি নেই, তৃপ্তি আছে। প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ কথা ভাবতে আনন্দ আছে যে, আমাদের এ দুঃখ বরণ আমাদেরই দেশবাসীর ভালোবাসা আর অগাধ স্নেহে সিক্ত।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', জনসাধারণকে সেই স্বর্গে উত্তরণের প্রার্থনা ছিল এ দেশের কবির। স্বাধীন সংবাদপত্রের লক্ষ্যও তাই। মনীষীরা তাই বলেছেন, স্বাধীন সংবাদপত্র ছাড়া স্বাধীন জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে না। শৃঙ্খলিত সংবাদপত্র শৃঙ্খলিত জনসমাজেরই প্রতীক। শৃঙ্খলিত জনসমাজের আত্মবিকাশ যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি-মানসের স্ফুরণও অকল্পনীয়। এক কথায়, স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছাড়া একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা কষ্টকর। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তাই প্রতিটি উন্নত ও স্বাধীন দেশে অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে মেনে নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনেও সংবাদপত্রের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আফ্রো-এশিয়ার দেশে দেশে জনসাধারণের পাশাপাশি সংবাদপত্রের বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক সংগ্রামের ফলে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হয়েছে বটে; কিন্তু বহু দেশেই আজ সেই শৃঙ্খল আবার সংবাদপত্রের হাতে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, নতুন দেশীয় শাসকেরা জানেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধই হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশে জনমতের যথার্থ কণ্ঠরোধ। তাই রাষ্ট্রীয়করণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণাদেশ আরোপ প্রভৃতি নানাভাবে নানা নামে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ খর্ব করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে নব্য স্বাধীন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সব চাইতে বড় ট্রাজেডিই সম্ভবত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপমৃত্যু অথবা মুমূর্ষু অবস্থা। এমন অবস্থাকে বেশিদিন চলতে দেয়া মানে একটি স্বাধীন জনসমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশঙ্কাকে ত্বরান্বিত করা। তাই শুধু সংবাদপত্রসেবী হিসেবে নয়, সংবাদপত্রের পাঠক বিপুল সংখ্যক জনসমাজের প্রতিনিধি হিসেবেও এ ভয়াবহ আশঙ্কাকে প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশেরই সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আপনাদের সিরাজগঞ্জের এই সাংবাদিক সম্মেলন এই ঐক্য ও সক্রিয়তারই প্রমাণ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে আপনারা বিশ্বের এমন একটি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, যে সমস্যার সঙ্গে এ দেশের গণতান্ত্রিক জীবনের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে যদি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা এবং শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকতো, তাহলে বিষয়টিকে শুধু সংবাদপত্রের কল্যাণের গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে এতটা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার কোন প্রয়োজন আদৌ থাকতো না। কিন্তু স্বাধীন সংবাদপত্র বলতেই আমরা বুঝি স্বাধীন জনমত, তাই জনমতের কণ্ঠরোধের অর্থই হলো গোটা সামাজিক স্বাধীনতার তাৎপর্যকে আমাদের কাছে মূল্যহীন করে তোলা। লর্ড ফ্রান্সিস উইলিয়ামসের ভাষায়, "The press is a weapon of freedom, a sword in the hands of those fighting old and new tyrannies –the one idispensable weapon in the armoury of freedom". সংবাদপত্র সম্পর্কে এই উক্তি অত্যুক্তি নয়। বিভিন্ন সমাজের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস যারা অবগত আছেন, তাঁরা জানেন, সকল দেশেই এই স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অগ্রপথিক সেনানীর ভূমিকা পালন করেছে সংবাদপত্র। স্বাধীন জনসমাজ আর স্বাধীন সংবাদপত্র কথা দুটি তাই পরস্পর পরিপূরক। তাই আমরা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা বলি, তখন ব্যাপক অর্থে জনসমাজের স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামের কথাই বলি। এই অধিকার ছাড়া কোন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অর্থহীন।

সংবাদ ও স্বাধীনতা এই কথা দুটির মধ্যে আক্ষরিক মিল ছাড়াও একটি ঐতিহাসিক দ্যোতনা আছে। মধ্যযুগে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিলো না এবং এর প্রয়োজনও ছিলো না। ব্যক্তিতন্ত্রের তখনো অভ্যুদয় হয়নি। ইতিহাস বলতে ছিলো রাজ-রাজড়ার কাহিনী; খবর বলতে ছিলো রাজা-বাদশার খবর। জনসাধারণ ছিলো ব্যক্তিগত প্রজাপুঞ্জ মাত্র। শিল্প-বিপ্লব কৃষিভিত্তিক সামন্ত যুগে ফাটল ধরালো। এলো প্রজাতন্ত্রের যুগ, ব্যক্তিতন্ত্রের যুগ। রাজার বদলে সাধারণ মানুষেরই সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হলো সমাজে। এই সাধারণ মানুষের খবর, সুখ-দুঃখ আর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি কণ্ঠে ধারণ করে প্রকাশিত হলো সংবাদপত্র। সামন্ততন্ত্রের পতনের মুহূর্তেও জনযুগের এই অভ্যুত্থানকে সামন্তশক্তি হিংস্র জিঘাংসায় দমন করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। সংবাদপত্রসেবীরা সব নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। সংবাদপত্র অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সম্পাদকদের পুড়িয়ে মারা

www.pathagar.com

হয়েছে, কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠ তাতে স্তব্ধ হয়নি। এমনি এক গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের, ঐতিহ্যের অধিকারী বলেই ব্রিটেনের জনসমাজের নাগরিক স্বাধীনতা আজ এতটা সুরক্ষিত; সেখানে স্বাধীন সংবাদপত্রের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু একটি সাপ্তাহিক কাগজের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ নিয়ে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লবে 'ইসক্রা'র (স্ফুলিঙ্গ) ভূমিকা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। পাক-ভারত উপমহাদেশেও স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী জাতিগঠনমূলক কাজে জাতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ভূমিকা আজ কোন কারণে খণ্ডিত বা খর্বিত হলে জাতীয় চেতনারই একটা বড় অংশ তাতে বিলুপ্ত হবে।

পূর্ব সূত্র ধরে পুনরায় উল্লেখ করছি যে, সংবাদপত্র এবং স্বাধীনতা এ কথা দুটোর ভেতর একটা দ্যোতনা রয়েছে। সংবাদপত্র আসলেই যখন জনসাধারণের খবরাখবর, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী প্রকাশের মাধ্যম, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, জনসাধারণকেই নিয়ন্ত্রণ করা। মধ্যযুগে সংবাদপত্র ছিলো না। সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক যুগের ফসল। গণতন্ত্রের একটা বড় অবলম্বন এই সংবাদপত্র। তাই কোন দেশের সরকার যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চালান। উন্নত ও সচেতন জনসমাজে এই হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত, কারণ জনসাধারণই সেখানে তাদের বহু যুগের সংগ্রাম-লব্ধ অধিকারের অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে বা সদ্যস্বাধীন দেশে জনসাধারণের সচেতনতার অভাব বা নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে চতুর শাসকবর্গ অনেক সময় সংবাদপত্রের অধিকার হরণের নামে জনসাধারণের অধিকার হরণ করে বসেন। অবশ্য স্বাধীনতা বা অধিকার বলতে আমি এখানে স্বেচ্ছাচারকে বোঝাচ্ছি না। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাসকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, সংবাদপত্র তার স্বাধীনতার অপব্যবহারে আগ্রহী। এই অভিযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি। দায়িত্বশীল সংবাদপত্র তৈরির একমাত্র পথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধের বেড়াজালের মাধ্যমেই অধিকার অপপ্রয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ রোধের আর একটা বড় উপায় দায়িত্বশীল জনমত সৃষ্টি। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের দ্বারা এই দায়িত্বশীল জনমত তৈরি সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমস্যার পার্থক্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মূলত উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমস্যা এক নয়। এ সম্পর্কে আমি আমার নিজের মতামত প্রকাশের আগে বিলেতের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সম্পাদকের একটি অভিমত এখানে উল্লেখ করব। গার্ডিয়ান সম্পাদক বলেছেন, বিলেতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সরকার এবং ব্যক্তিগত মালিকানা কোন বড় প্রতিবন্ধক নয়;

www.pathagar.com

কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার কাজগুলো এখন বড় বড় ট্রাস্টে পরিণত হচ্ছে। আর গণতান্ত্রিক সরকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু বিভিন্ন একচেটিয়া বড় ব্যবসায়ী, যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরের কাগজ বাঁচিয়ে রাখেন, তারা সময় সময় নানাভাবে সংবাদপত্রকে নিজেদের অনুকূলে প্রবাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞাপনদাতা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। কিন্তু স্বল্পোন্নত ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলোতে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্যক্তিগত মালিকানা বা বেসরকারি বিজ্ঞাপনদাতা শ্রেণী এখনও স্বল্পোন্নত দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ এখন পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বময় প্রতিভু সরকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও তাই এ সকল দেশে ত্রিবিধ ক্ষমতার খড়্গ সর্বদা উত্তোলিত থাকে। সংবাদপত্রকে কোন কোন স্বল্পোন্নত দেশে তিনভাবেই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমত, সরাসরি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এটাকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। বাকি দুরটা পরোক্ষ অথচ অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা। প্রথমত, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাদেশ এবং দ্বিতীয়ত, সরকারি বিজ্ঞাপন দ্বারা সংবাদপত্রের আর্থিক ক্ষমতায় আঘাত হানা। এভাবে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রশাসনিক যন্ত্রও আসলে জনতারই কণ্ঠরোধ করেন। এতে স্বাধীন সমাজের বিকাশ ব্যাহত হয়; রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গোটাকতক ব্যক্তি বা পরিবারে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা বশীভূতকরণ জনসমাজে বুদ্ধি ও কৃষ্টির চর্চায়ও বিশেষ কায়েমী স্বার্থের পরিপূরক হয়ে ওঠে। ফলে, জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুভূত না হলেও যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার অনিষ্টকর প্রভাবের জের চলতে থাকে।

আমি আমার বক্তব্যে জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়ন, এ কথা দুটোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। স্বল্পোন্নত দেশে জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নই হচ্ছে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রকৃত পরিমাপক ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ভিত্তি ছাড়া জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। তাই আমরা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলি, তখন আসলে বিশেষ কোন প্রচারযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা না বলে জনমত এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের স্বাধীনতার কথাই বলি। কিন্তু পরাধীন যুগের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হয় পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয় না, অথবা উপলব্ধি করার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন না। এ জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তি দায়ী নন; দায়ী প্রচলিত ব্যবস্থা। কারণ আমরা স্বাধীনতা অর্জনের পর যে প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কাঠামো লাভ করেছি, তার ভিত্তি ও মানসিকতা আসলে পরাধীন যুগের। সে যুগে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণকেই বোঝাত। জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বের তেমন কোন সম্পর্ক ছিলো না। আঠার বছর আগে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি বটে, কিন্তু আমরা আমলাতন্ত্রের এই কাঠামো ও

www.pathagar.com

মানসিকতার সময়োপযোগী পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের সাথে একটি স্বাধীন জনসমাজের মতামতের যে সম্পর্ক, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা পূর্ণভাবে অনুভূত নয়। কাজেই জনমত ও সংবাদপত্রের মতামতকে গ্রাহ্য করা বা গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সফলতা লাভ করতে পারেনি। এ জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বা নীতিকে দায়ী করা উচিত নয়। এ জন্য দায়ী প্রচলিত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কাঠামোগত ও মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া তাই সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক যেমন স্বাভাবিক হতে পারে না, তেমনি জনমতের বাহন হিসেবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও সুনিশ্চিত হতে পারে না।

আমি আগেই বলেছি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা অধিকার রক্ষার সংগ্রাম তার নিজের কোন সংগ্রাম নয়, জনসাধারণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামেরই নামান্তর মাত্র। খবর সংগ্রহ ও খবর প্রকাশের অধিকার আসলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ প্রকাশেরই অধিকার। এ অধিকার খর্ব হওয়ার অর্থ জনসাধারণের অধিকার খর্ব হওয়া। কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ অবস্থা কাম্য হতে পারে না। কারণ সংবাদপত্রের পাতায় জনসাধারণের যে অভাব-অভিযোগ প্রকাশিত হয় বা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকারকে নীতি নির্ধারণে তা বহুভাবে সাহায্য করে। সংবাদপত্রের এ সাহায্য ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক সরকার চলতে পারে না। সরকার যদি জনগণের পাশ কাটিয়ে চলতে চান, তবে কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠার আশা সফল হতে পারে না।

স্বল্পোন্নত দেশের সমস্যা অনেক। তাই সংবাদপত্রের দায়িত্বও এখানে সমধিক। স্বাধীনতা লাভের আগে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় জনজীবনের জন্য যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো, স্বাধীনতা লাভের পর তা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব হয়নি; বরং বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ভ্রান্তি ও সরকারি নীতির অপরিণামদর্শিতার জন্য তা জটিল হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে অবশ্যই প্রশাসনিক ভ্রান্তি ও সরকারি নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনস্বার্থের খাতিরেই মুখর হতে হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সংবাদপত্র বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে। বিরোধী দলের ভূমিকা যেখানে সরকারি নীতির বিকল্প নিজস্ব কর্মসূচি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে এবং তার ভিত্তিতে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, সেখানে সংবাদপত্রের ভূমিকা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা নয়; ক্ষমতাসীনদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে জনমতের আলোকে তাদের সঠিক নীতি প্রণয়নে সাহায্য করা। এক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমেরই অনিষ্ট হবে। এতে সরকার যেমন নিরপেক্ষ যথার্থ জনমত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি সরকারি নীতিতে জনমতের প্রতিফলন না ঘটার দরুন জনসাধারণও সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এই পারস্পরিক সংযোগ ও আস্থার অভাব যেকোন দেশে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একটা আন্তর্জাতিক দিকও রয়েছে। যে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, সে দেশ বহির্বিশ্বে যেমন মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে না, তেমনি

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ও সঠিক খবরের পরিবর্তে সে দেশ সম্পর্কে নানা গুজবও রটতে শুরু করে। এ সম্বন্ধে আমি একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতে চাই। ১৯৬২ সালে ঢাকার ছাত্রবিক্ষোভ সম্পর্কে খবর পরিবেশনে বিধি-নিষেধ আরোপিত না হলে সম্ভবত বহির্বিশ্ব ঐ সম্পর্কে সঠিক খবর অবগত হতে সক্ষম হতো। কিন্তু সঠিক খবরের অভাবে সে সময় বিভ্রান্তিকর গুজব খবরের স্থান দখল করে নিয়েছিলো। বিলেতের একটি দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী দৈনিক এই মর্মে খবরও প্রকাশ করেছিলো যে, বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ঢাকার পোতাশ্রয় ভস্মীভূত হয়েছে। অথচ আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, ঢাকায় কোন পোতাশ্রয় নেই এবং সেই কল্পিত পোতাশ্রয়ে কখনো অগ্নিকাণ্ডও সংঘটিত হয়নি।

আমাদের মত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং স্বল্পোন্নত দেশে সংবাদপত্র শিল্প বয়েসে নবীন এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে ততটা পরিপক্ব নয়; তাই সংবাদপত্রের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় যে আতিশয্যমূলক উদাহরণ নেই, তা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলো ঘটনা হিসেবে বিরল ব্যতিক্রম। দেশের স্বাভাবিক আইনই এ সব ব্যতিক্রমী আতিশয্যের প্রতিবিধানে সক্ষম। এ অবস্থায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও যখন সংবাদপত্রের অধিকার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আইন বা অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হয়, তখন আমাদের নাগরিক স্বাধীনতাই প্রকারান্তরে বিপন্ন না হয়ে পারে না।

অর্ডিন্যান্স শাসিত সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা কষ্টকর। তথাপি সংবাদপত্রের তথা জনসমাজের এ অধিকার সংরক্ষণে এ দেশের সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রসেবীদের ভূমিকা কম অনুপ্রেরণামূলক নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আপনাদের সংবাদপত্র শিল্পকে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ শুধু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে, সেই ইতিহাস কমবেশি আপনাদের সকলের জানা। নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার এ সংগ্রামে আমরা সকলেই সহযোদ্ধা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু এ তাত্ত্বিক ব্যাপারের পরিবর্তে এর প্রয়োগমূল্য সম্পর্কেই আজ আমাদের সকলের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। আমরা দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণের যে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছি, সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালনের মধ্যেই আমাদের পেশার সার্থকতা ও সাফল্য নিহিত। রোষ অথবা প্রলোভন কোন কিছুতেই আমরা এই মহান দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। আগেই বলেছি, আমি সূর্য-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। আপনাদেরও এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং বলবান হওয়ার আহ্বান আমি জানাই। আসুন, সহকর্মীর শখ্যতায়, সহমর্মীর সহৃদয়তায় আমরা অন্য সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হই। কেবল এই ঐক্যের পথেই দিগ্বলয়ের তিমিরাবসান আরো ত্বরান্বিত এবং আরো সুনিশ্চিত হতে পারে।

১৯৬৬ সালের ৮ মে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের ভূমিকা

সালতামামীর হিসেবে প্রবীণতার দাবি নিয়ে আপনাদের আমি উপদেশ দিতে আসিনি। আমি এসেছি তরুণ প্রাণের সঞ্জীবনী স্পর্শে আমার আপন সত্তার বিগত তিথিকে স্মরণ করতে। দুনিয়াব্যাপী আজকের এই বিচিত্র আলোড়নের দিনে তরুণেরাই দেশে দেশে যুগান্তরের বার্তা বয়ে আনছেন; দেশ, জাতি ও জনতাকে দিচ্ছেন নব সম্ভাবনার পথনির্দেশ। জীবনের এই বিশ্বজনীন উদ্বোধন ও আন্দোলন থেকে আমাদের দেশের তরুণেরাও বিচ্ছিন্ন নন। তাই তরুণ প্রাণের তীর্থসঙ্গমে একাত্ম হয়ে জীবনের সেই অংশটিকেই আমি আবিষ্কার করতে চাই, যা অন্যায় কর্তৃত্বের শাসনকে অলংঘনীয় বিধিলিপি বলে মেনে নিতে সম্মত নয়; যা পর্বতপ্রমাণ প্রতিকূলতার মুখেও পিছু হটতে জানে না; যা সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে যুক্তি, ন্যায় ও সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াসী।

ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে প্রথাসিদ্ধ ভাষণদান আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগকে আমি নিষ্ফল হতে দিতে রাজী নয়। স্বভাবতই যে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে। সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কে দীর্ঘদিনের। শিল্প হিসেবে এবং বৃত্তি হিসেবে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমি দাবি করতে পারি। সংবাদপত্রের মূল্য ও উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি যা কিছু বলবো, তা সে অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। তবে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সমস্যার বিষয় আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

আধুনিককালে পৃথিবীর কোন কোন এলাকা অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত এলাকা বলে কথিত। স্বল্পোন্নত এলাকা বলতে সাধারণতঃ আমরা কী বুঝি, সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ধারণা আছে। তবুও বলি, কোন দেশ বা অঞ্চলের বেলায় স্বল্পোন্নত শব্দটির প্রয়োগ শুধু বৈষয়িক দিকটার প্রতিই ইঙ্গিত করে। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব এলাকা স্বল্পোন্নত বলে কথিত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সেগুলো আজকের উন্নত দেশগুলোর চেয়ে পশ্চাৎপদ ত নয়ই, বরং অনেক বেশি প্রবীণ এবং অনেক বেশি ঐতিহ্যশালী। আজকের উন্নত অঞ্চলের অনেক দেশে সামাজিক জীবনযাপন যখন সংগঠিত রূপলাভ করেনি, তথাকথিত স্বল্পোন্নত অঞ্চলের বহু দেশ তখন সভ্যতার নানাদিকে বিকাশমান। কাজেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে নয়, উন্নত ও স্বল্পোন্নত

www.pathagar.com

শব্দের তাৎপর্য ব্যবহারিক জীবনের বৈষয়িক উপকরণের মাপকাঠিতেই বিচার্য। কিছুটা সরলীকৃত ব্যাখ্যায় বলা যায়, যে-দেশ প্রধানত কৃষিভিত্তিক অথচ চাষাবাদ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত নয়, পক্ষান্তরে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, যে-দেশ ব্যবহারিক উপকরণের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, সে দেশই স্বল্পোন্নত দেশ নামে পরিচিত।

স্বল্পোন্নত দেশের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম চোখে পড়ে, তা হচ্ছে ন্যায় বিচারের অভাব। কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজজীবন, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি, সর্বত্র ন্যায়বিচারের অভাবটাই সেখানে বিশেষভাবে প্রকট। আমরা দেখতে পাই, স্বল্পোন্নত দেশে মুষ্টিমেয় লোক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধনবান হয়ে ওঠেন; যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁদের ঘিরেই আবর্তিত হয়; তাঁদের ভাগে যায় সমস্ত প্লান-পরিকল্পনার বেশির ভাগ ফায়দা। ফলে, দেশের অধিকাংশ সম্পদ তাঁদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন হিসেবে জনগণের জীবনে দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য থেকে জন্ম নেয় অনেক রকম সমস্যা। সে সব সমস্যা ক্রমে বিস্তার লাভ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। দেশের রাজনীতি তখন আর জনসাধারণের রাজনীতি থাকে না। ক্রমে ক্রমে তা ধনকুবেরের রাজনীতিতে পরিণত হয়। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর মতে ধনকুবেরের রাজনীতির আমলে মহাজনী ব্যবসা চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা বর্ধনের প্রয়োজনেই রচিত হয় সেই রাজনীতির গতিপথ। সেই রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের স্থান নেই, সাধারণ মানুষের প্রশ্ন নেই। সেই রাজনীতি একান্তভাবেই রজতচক্রের ঐন্দ্রজালিক মায়ায় আবদ্ধ। তাতে করে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হারায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়, জনগণের জীবনে সমস্যার উপর সমস্যা স্তূপীকৃত হতে থাকে। এমনি করে সৃষ্টি হয় এক অচলায়তনের আর সে অচলায়তনে জনসাধারণের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এই নিদারুণ অস্বাভাবিকতাই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বল্পোন্নত অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র।

কিন্তু বলা বাহুল্য, এ অবস্থা জীবনধর্মের বিরোধী এবং জীবনধর্মের বিরোধী বলেই জনগণ এ অবস্থাকে নত মস্তকে মেনে নেয় না। জীবনধর্মের খাতিরেই মেনে নিতে পারে না এবং পারে না বলেই অসংখ্য সমস্যার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ তাদের খুঁজতে হয়। তাদের জানতে হয় তাদের সমস্যার কথা। কিন্তু জানার পথ কী? পথ হচ্ছে জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলো। বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রই জনমত প্রকাশের সর্বজন স্বীকৃত মাধ্যম। অবশ্য অনেকে আজকাল বলে থাকেন, জনমত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের পূর্ব গুরুত্ব এখন আর অক্ষুণ্ন নেই। বেতার ও টেলিভিশন সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, এ অভিমত যতটা বাহ্যিক লক্ষণাশ্রয়ী, ততটা বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, কারিগরি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও আমরা জানি, মাত্র এক দশক আগে সে দেশে সংবাদপত্রের যে প্রচার সংখ্যা ছিল, আজ সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি। কোন কোন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে দেড় থেকে দুই গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

এক হিসাব থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৭৩০ এবং সংবাদপত্রের দৈনিক মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছয় কোটির উপর। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের কার্যরত মানুষের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার। পক্ষান্তরে, বেতার ও টেলিভিশনে মিলিয়ে কর্মরত মানুষের সংখ্যা মাত্র ৯৩ হাজার। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯৩ জন সংবাদপত্রের পাঠক। যুক্তরাষ্ট্রের এই হিসাব শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বেলাতেই নয়, প্রতিটি উন্নত দেশের ক্ষেত্রেই সত্য। এমনকি একটি মাত্র দৈনিক সংবাদপত্রের প্রত্যহ ৩৫ লক্ষ কপি মুদ্রিত হওয়ার বিষয়ও আমাদের জানা আছে। সংবাদপত্রের এই বিপুল প্রচার সংখ্যা এবং তার ক্রমবর্ধমান গতি আর যাই হোক, সংবাদপত্রের গুরুত্ব হ্রাসের লক্ষণ হিসেবে নিশ্চয়ই বিবেচিত হতে পারে না।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আবার তা নয়। আমরা জানি, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেলিভিশন ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। বেতার ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তাও সুবিন্যস্ত নয়। তদুপরি যেটুকু-বা বেতার ব্যবস্থা আছে, তার প্রায় সর্বাংশ সরকারি কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত; অর্থাৎ অন্য কথায়, বেতার ব্যবস্থা সরকারি মতের মাধ্যম হিসেবেই আজো কাজ করছে; জনমত প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়নি। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশে জনমত প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে আজো সংবাদপত্রকেই আমরা দেখতে পাই এবং আমার নিজের ধারণা, আরো অনেকদিন যাবৎ এই অবস্থা বহাল থাকবে। সংবাদপত্রের ভূমিকা তাই অতুলনীয় ও অনন্য অধিকারী। এই গুরুত্বের দরুন সংবাদপত্রের দায়িত্ব যেমন অসীম, তেমনি সেই দায়িত্ব পালনে তার কিছু অধিকার থাকাও একান্ত আবশ্যক। বস্তুত সেই অধিকার না থাকলে সংবাদপত্রের পক্ষে যথারীতি দায়িত্ব পালন করা কখনো সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এ বিষয়টিই আমি এখানে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে অনুন্নত দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের জন্ম, বিকাশ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

আমরা জানি, স্বল্পোন্নত অঞ্চল বলে যে দেশগুলো পরিচিত, সেগুলো কিছুকাল পূর্বেও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন বিদ্যমান থাকাকালে দেশীয় সংবাদপত্রের গ্রহণীয় ভূমিকা ছিল একটাই; সেটা হচ্ছে নিজেদের জড়িত করা। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে সংবাদপত্রগুলো সে দায়িত্ব পালন করেছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। সংগ্রামী জন সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তারা একাত্মতা অনুভব করেছে। তা তারা প্রতিফলিত করেছে এবং সংগ্রামী জনতার মত সংবাদপত্রগুলোও ঔপনিবেশিক শাসনের নির্যাতন ভোগ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সংবাদপত্রের সংগ্রামের সবল ধারা অনিবার্য কারণেই পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। বিদেশী উপনিবেশবাদীদের প্রস্থানের পর দেশীয় লোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশীয় লোকদের ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাদুমন্ত্রের ক্রিয়ার ন্যায় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। সমস্যা থেকেই গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অদূরদর্শী ও অবাস্তব নীতির ফলে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় দেশীয় সংবাদপত্রের কর্তব্য কী ছিল? দেশীয় লোক ক্ষমতাসীন হয়েছেন বলেই কি সংবাদপত্রের মৌনব্রত অবলম্বন করা সঙ্গত হতো? তাহলে জনজীবনের সমস্যার উপর আলোকপাতের আর কী উপায় থাকতো? এ সমস্যার কথা জানা না গেলে তার সমাধানের চেষ্টাই বা হতো কেমন করে?

কাজেই ক্ষমতার হস্তান্তর সত্ত্বেও সংবাদপত্রের দায়িত্ব হ্রাস পায়নি; বরং ক্ষমতাসীন সরকার ও জনসাধারণ উভয় প্রান্তে কর্তব্য সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল অনেক। স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রসমূহ সে দায়িত্ব পালন করবারই চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে স্বল্পোন্নত দেশে সংবাদপত্রকে কুড়াতে হয়েছে সরকারের অসন্তোষ। কেউ কেউ মনে করেন, স্বল্পোন্নত অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলো বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়েই যতসব ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে। সংবাদপত্রের ভূমিকাকে তারা বিরোধী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সমার্থক ভাবেন। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বিরোধী দলকে নিষ্ক্রিয় করবার চেষ্টা হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা। সংবাদপত্রের আচরণকে সংযত করার নামে আরোপিত হচ্ছে নানা রকম কঠোর বিধি-নিষেধ। আমি মনে করি, সংবাদপত্র ও বিরোধী দলের ভূমিকাকে সমার্থক মনে করা একান্তই ভ্রমাত্মক। সংবাদপত্র যে বিরোধী দলের মতামতকে অনেক সময় বেশি প্রাধান্য দেয়, তাতে তার ভূমিকার কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে তার কারণ অন্যত্র। আমাদের সবারই জানা আছে, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সব দেশের সরকারই নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা চেপে রাখতে চায়। স্বল্পোন্নত দেশে যেহেতু সমস্যার পরিমাণ অধিক এবং জীবনযাত্রার মান নীচু, সে কারণে স্বল্পোন্নত দেশে সরকারের এই প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জনজীবনের সমস্যা চাপা পড়ে যাবার উপক্রম হয়। তাই জনজীবনের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরে প্রতিকার দাবি করার দায়িত্ব বর্তায় বিরোধীদলের উপর। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে বিরোধীদল এক সময়ে ক্ষমতাসীন হয়। পরবর্তী পরিস্থিতিতে পূর্বতন ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করে। নয়তো নতুন কোন বিরোধীদল শূন্যস্থান পূর্ণ করে। মোটকথা, জনজীবনের সমস্যা বিরোধীদলের দ্বারাই প্রতিফলিত হয়। এখানেই বিরোধী দলের ভূমিকার সঙ্গে জনজীবনের যোগাযোগ ঘটে সংবাদপত্রের ভূমিকার। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সর্ব-সমক্ষে তুলে ধরাই যেহেতু সংবাদপত্রের মুখ্য ও প্রধানতম দায়িত্ব, সে কারণে বিরোধীদলের বক্তব্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রচারিত হয়। কে বলেছেন এবং তিনি কোন দলভুক্ত সেটা নয়, বরং কী কথা বলা হচ্ছে এবং সেই বলায় জনজীবনের সমস্যার উপর আলোকসম্পাত হচ্ছে কি-না, সেটাই সংবাদপত্রের বিবেচ্য। সেই বিবেচনার দ্বারাই সংবাদপত্রের কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই যদি বিরোধীদল ও সংবাদপত্রের ভূমিকাকে সমার্থক চিন্তা করা হয়, তবে তা মূলতই ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। পরিতাপের বিষয়, স্বল্পোন্নত অঞ্চলের অধিকাংশ দেশে এমনি ধারা ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করছি।

www.pathagar.com

এ কথা আমরা স্বীকার করবো যে, দীর্ঘকালের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভের পর স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রগুলো কোন কোন সময়ে যথার্থ সমীচীনতার সীমা মেনে চলতে পারেনি। কোন কোন সময়ে উষ্মার আধিক্য ঘটেছে। কোন কোন সময়ে পারস্পরিক কলহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অপ্রত্যাশিত উত্তাপ। আমার মনে হয়, স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রসমূহ বয়সে নবীন। কোন কোন দেশে স্বাধীনতার পরই অধিকাংশ সংবাদপত্রের জন্ম হয়। মানুষের বেলায় তথা জীবনজগতের বেলায় একটা সাধারণ লক্ষণের কথা আমরা জানি যে, তারুণ্যের একটা উচ্ছলতা থাকে। সেই উচ্ছলতা কিংবা উদ্দামতা সকল সময়েই নিন্দনীয় এমন কথা বলা অসঙ্গত। তবে কোন কোন সময়ে তা যে অনভিপ্রেত আকার ধারণ করে না, একথা আমরা বলব না। স্বল্পোন্নত অঞ্চলে অনেক দেশের সংবাদপত্রের আচরণে এই অনভিপ্রেত লক্ষণ কখনো কখনো অবশ্যিই পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু যেমন মানুষের বেলায়, তেমনিই সংবাদপত্রের বেলায়ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচরণ প্রজ্ঞামণ্ডিত হয়ে ধীরস্থির রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক উন্নত দেশের সংবাদপত্রের জীবনেই তা ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশের সংবাদপত্রের জীবনেও তা না ঘটবার কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, স্বল্পোন্নত দেশের কর্তৃপক্ষ সেইটুকু সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত নন। তাই নানা রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। ঔচিত্যবোধ বা সহিষ্ণুতার বদলে পরমতে অসহিষ্ণুতাই চলছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার মানসিকতা কিন্তু কি সরকার কি জনসাধারণ, কারো কোন কল্যাণে আসছে না। বরং এসব বিধি-নিষেধ দ্বারা সংবাদপত্রের ভূমিকার মূল্য ও কার্যকারিতাকেই নষ্ট করা হচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে, সংবাদপত্র নিছক একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়। আর দশটা শিল্পের মত সংবাদপত্র একটি নির্ভেজাল মুনাফাকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়। পূর্বেই বলেছি, জনমত তুলে ধরাই সংবাদপত্রের মুখ্য কাজ এবং জনমতকে সঠিকভাবে তুলে ধরবার উপরই নির্ভর করে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা। তাই সংবাদপত্র যে অধিকার দাবি করে তা শুধু তার নিজের জন্য নয়, জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণের খাতিরেই সেই দাবি করতে হয়। সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ পরিবেশন এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা তজ্জন্যই দরকার যে, এই স্বাধীনতা না থাকলে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা-বেদনা প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়। এই সংবাদপত্রকে বিধি-নিষেধের মধ্যে কাজ করতে হলে শুধু যে সংবাদপত্রসেবীর সৃজনী শক্তি ব্যাহত হয় বা শুধু যে একটি শিল্পের বিকাশ সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তাই নয়; সংবাদপত্রের উপর জনসাধারণের আস্থাই নষ্ট হয়ে যায়। জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, স্বাধীনভাবে কিছু লেখার ক্ষমতা সংবাদপত্রের নেই, তখন তারা সংবাদপত্রের কোন কথাতেই আস্থা স্থাপন করতে পারে না। তদবস্থায় সরকারি প্রচার দফতরের ক্রোড়পত্র এবং সংবাদপত্রের মধ্যে মূল্য ও মর্যাদার বস্তুত কোন পার্থক্য থাকে না। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের পক্ষে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না এবং বেঁচে থাকলেও এর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এক কথায় সেরূপ অবস্থায় সংবাদপত্রের থাকা না থাকা প্রায় সমান।

www.pathagar.com

কেবল তাই নয়। এর একটা আন্তর্জাতিক দিকও রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে দেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট দেশটিকে তখন বহির্জগৎ হেয় চোখে দেখতে আরম্ভ করে। তদ্বারা বিশ্বের দরবারে সে দেশ শুধু মান-মর্যাদাই হারায় না, অন্যভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কাজেই যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, বিধি-নিষেধ আরোপ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার কাজকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। যে কোন দেশে সংবাদপত্রের উপর হামলা এসেছে, সে দেশের জনগণ তা প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করেছে সর্বশক্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের অধীনে, তখন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার কাজকে উপলক্ষ করে কী নিদারুণ অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল, তা অনেকেরই জানা থাকার কথা। 'পাবলিক অকারেন্স' নামে ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে বোস্টন শহর থেকে প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ম্যাসাচ্যুসেটস স্টেটের ব্রিটিশ গভর্নর তা বন্ধ করে দেন। তাই নিয়ে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, ক্রমে তা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী সংগ্রামের দাবানলে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক সেই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উপক্রমণিকা বলে বিবেচনা করে। আধুনিককালেও আমরা পৃথিবীর বহু দেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে রীতিমত উপবিপ্লব ঘটে যেতে দেখছি।

অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে কৌশল কিছুটা পরিবর্তিত হতে দেখা যাচ্ছে। জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে কোন কোন স্বল্পোন্নত দেশে অধুনা ভিন্নতর পথ অবলম্বন করা হচ্ছে। তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশে সংবাদপত্রের আচরণ সংক্রান্ত 'প্রেস এথিকস কোড' প্রবর্তিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এটা সরকারি জবরদস্তি নয়; বরং উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ইত্যাকার বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে সংবাদপত্রের সংযত আচণের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটা সাধারণ উপলব্ধির কথা যে, প্রত্যক্ষই হোক কিংবা ছদ্মাবরণের সাহায্যেই হোক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার পরিণাম ফল কোরিয়ার সংবাদপত্রের আচরণ-বিধি যে আসলে 'ছদ্মবেশি নিয়ন্ত্রক' তা কারো অজানা নেই।

আমরা সচেতন যে, সমাজের অন্যান্য অংশের ন্যায় সংবাদপত্রও নির্দোষ কিংবা ত্রুটিমুক্ত নয়। ত্রুটি একেবারেই থাকবে না, এটা কোনকালেই সম্ভব হতে পারে না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সংবাদপত্রের মহান ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের পক্ষে আত্মসংযম একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই আত্মসংযম থাকতে হবে স্বতঃপ্রবৃত্ততার উপর। সংবাদপত্রসেবীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সে সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সংবাদপত্রের নিয়মানুবর্তিতা ও সংযত আচরণের বিধি-ব্যবস্থা নিজেরাই তৈরি করতে সক্ষম। নিজেদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং জনগণের স্বার্থের খাতিরেই তা করতে তারা সর্বদাই উন্মুখ। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পেতে পারি ব্রিটেনের নিকট থেকে। ব্রিটেনে একটি প্রেস কাউন্সিল রয়েছে। কিন্তু তথাকার সংবাদপত্রগুলো নিজেরাই এমন

www.pathagar.com

আত্মসংযম অভ্যাস করেছে যে, প্রেস কাউন্সিলের বিধান কদাপি প্রয়োগ করারই প্রয়োজন হয় না। বস্তুত একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকদের যেমন পাঠশালার বালকদের মত সংযত রাজনীতির সবক দেয়া যায় না, তেমনি সংবাদপত্রকেও সরকারি বিধি-নিষেধ দ্বারা সংযত আচরণে বাধ্য করার চেষ্টা নিরর্থক। একমাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ততার স্বাভাবিক পথেই তা সম্ভব।

স্বল্পোন্নত অঞ্চলের অন্যতম দেশ হিসেবে বিধি-নিষেধের দৌরাত্ম্য আমরাও ভোগ করছি। সম্ভবত, অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিধি-নিষেধের পীড়ন অনেক বেশি। আপনারা সবাই জানেন, বিগত সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সংবাদপত্রের উপর এক নতুন অর্ডিন্যান্স জারি হয়। এই অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলো এতই ব্যাপক ও কঠোর যে, তাতে করে পাকিস্তানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একেবারেই নস্যাৎ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সম্ভবত তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে, বিশেষ করে সংবাদপত্রসেবী মহলে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আমরা সেই অর্ডিন্যান্সের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিছু কিছু সংশোধনের মাধ্যমে অবস্থার কতটুকু বাস্তব উন্নতি সম্ভবপর, তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সত্য কথা বলতে কি, পরিপূর্ণ স্বাভাবিকতার অবাধ প্রচলন ব্যতীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশটি দক্ষিণ কোরিয়ার সমগোত্রের দেশে পর্যবসিত হোক, এটা কারো কাম্য হতে পারে না।

আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। এবার আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। তবে বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বলবো, তরুণের প্রাণশক্তিতে আমার বিশ্বাস প্রগাঢ়। আমরা যারা বানপ্রস্থের দোর-গোড়ায় উপনীত, তারা তরুণদের প্রাণশক্তির উপর ভরসা করেই আশাবাদী হয়ে উঠতে চাই। বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জীবনও তরুণদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারাই যুগান্তরের পথে, পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। আপনাদের সকল জীবনোদ্যোগ সাফল্যের এক সূর্যতোরণ থেকে অন্য সূর্যতোরণে উত্তীর্ণ হোক, এই শুভেচ্ছা জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৯৬৩ সালের ১৯ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের নীতি ও পরিচালনা

সংবাদপত্রের ভূমিকা, বিশেষত সংবাদপত্রের নীতি ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের দেশের সুধী মহলের ধারণা সুষ্ঠু নয় বলিয়া মনে হয়। একটা প্রকাশিত সংবাদকে সম্পাদকের কিংবা পরিচালকের মতামত বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহার জন্য সম্পাদকই দায়ী। সেটা অবশ্য অপরাধ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়।

সংবাদপত্র পরিচালনা মালিক, সম্পাদক, এমনকি বার্তা সম্পাদক কাহারও একক দায়িত্বে বা কর্তৃত্বে সম্পন্ন হইতে পারে না। নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মালিকের ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু নীতি পালনের ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষমতা সংকুচিত (ইত্তেফাকের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম; যেহেতু মালিক ও সম্পাদক একই ব্যক্তি)। কেননা, সম্পাদক এবং অন্য যাহারা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উপরই পত্রিকার নীতি পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব নির্ভর করে। গোটা পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সব খবর, প্রবন্ধ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন, কিন্তু সব মানুষের বিচার-বুদ্ধি এক ধরনের হয় না, হইতে পারে না। একজন যেটাকে সঠিক মনে করেন, অপরজনের বিচারে তাহা বেঠিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কেও বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে। কাহারও কাহারও ধারণা, যিনি যাহা বলিতে চান, খবর হিসাবে তাহা প্রকাশ করা উচিত। সব ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না। আইন-কানুনের প্রশ্ন বাদ দিয়াও সংবাদপত্রে এমন কোন বিতর্কমূলক বিবৃতি বা বক্তৃতা ছাপান যাইতে পারে না, যাহা শুধু পত্রিকাবিশেষের নীতিবিরোধীই নহে, যাহা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পর্যবসিত হইতে পারে এবং মূল সমস্যা হইতে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে এক ছাত্রসম্মেলনে জনৈক কবি তাঁহার বক্তৃতা -বিবৃতি ও কবিতা সব সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ মালিকের স্বাধীনতা, সাংবাদিকের কিংবা সমাজের স্বাধীনতা নয়। তাঁহার এই অভিযোগ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ প্রসূত। প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। কোন সংবাদপত্রের মালিক জনমতের তোয়াক্কা না করিয়া নিজের মতামত পাঠকের উপর চাপাইতে গেলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই অনুতপ্ত হইতে হয়। ইহার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। কোন পত্রিকা বিশেষ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সাময়িকভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করিতে পারিলেও দীর্ঘ সময়ের জন্য তাহা করিতে পারে না, বরং ইহাতে পত্রিকার সার্কুলেশন হ্রাস পায় এবং জনমতের উপর পত্রিকাবিশেষের কোন প্রভাব থাকে না। ভারতের শ্রী রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনিক। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রভাবশালী ও সর্বোচ্চ সার্কুলেশনের পত্রিকা 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'সহ তিনি ইংরেজি, গুজরাটি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহু পত্রিকার মালিক বনিলেন। এতগুলো পত্রিকার মালিক বনিবার পর তাঁহার রাজনীতি করার খায়েশ হইল এবং তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মালিকানাধীন পত্রিকাসমূহে প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁহার ছবিসহ প্রায় প্রতিদিন তাঁহার বক্তৃতা-বিবৃতি প্রকাশ হইতে লাগিল। কিছুকাল যাইতে না যাইতেই এই 'হঠাৎ রাজনীতি'-এর গান্ধা বক্তৃতা-বিবৃতি প্রকাশের জন্য তাঁহার পত্রিকাসমূহের সার্কুলেশন দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত পত্রিকাগুলোকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে রাজনীতি হইতে সরিয়া পড়িতে হইল। এই জনমতই প্রকৃত প্রস্তাবে সংবাদপত্রের নিয়ন্তা। মালিকের খামখেয়ালী নীতি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অচল।

কবি সাহেব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাও অসার। কবি, লেখক বা রাজনীতিক মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা যাহা লিখেন বা বলেন, তাহাই চরম বা পরম সত্য এবং তাঁহাদের লেখা বা বক্তৃতা ছাড়া অন্য কাহারও লেখা বা বক্তব্যের প্রতি জনগণের আকর্ষণ নাই। ইহা এক-চোখা দৃষ্টিভঙ্গী। কার লেখা সমাজে কতখানি আদৃত, সে প্রশ্ন ছাড়াও সংবাদপত্রে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্নও সংবাদপত্র পরিচালককে বিবেচনা করিতে হয়। কবি বা লেখক তাঁহাদের পুস্তকের ভূমিকা এমন লোককে লিখিতে দিবেন না– যিনি তাঁহার পুস্তকের বিরূপ সমালোচনা করিবেন। সংবাদপত্রেরও একইভাবে লেখকের লেখা বাছাইয়ের অধিকার আছে এবং থাকা উচিত।

বিতর্কমূলক বিবৃতিও সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে এবং যে মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের নীতির মিল নাই, সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাহার সমালোচনা করা যাইতে পারে। তবে এমন সব বিতর্কমূলক বিবৃতি সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা উচিত নয়, যার ফলে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ শেষ পর্যন্ত কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পরিণত হয়। ধরুন, একটা অপহরণের (Kidnapping) অভিযোগ। প্রথমত, 'অপহরণ' এবং অভিযোগ সত্য হইলে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের অভিযোগ প্রকাশ করা হইলে প্রতিপক্ষের বক্তব্যও প্রকাশ করা সাংবাদিকতার নীতিভুক্ত। কিন্তু এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ কোন পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে, তাহা কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে না। পক্ষান্তরে, আইন-আদালতের আশ্রয় নিলে প্রকৃত অবস্থা ছাড়া ভাবাতিশয্যের অবকাশ থাকিত না; কারও পক্ষে আদালতের বাহিরে ঝড় সৃষ্টির সুযোগ থাকিত না। সর্বোপরি, প্রমাণ নাই এমন অভিযোগও উত্থাপন করা যাইতে পারে না।

www.pathagar.com

অবশ্য সংবাদপত্রের পক্ষে এ ব্যাপারে দুইটি পথ খোলা ছিল। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ একের পর এক প্রকাশ করা, নয় ইহাকে একদম ব্যক্তিগত ঝগড়া-ঝাটি হিসাবে গণ্য করিয়া সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই ধরনের অভিযোগ আদৌ স্থান না দেওয়া। যেখানে আইন-আদালতের দরজা খোলা, সেখানে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিতর্কের সূত্রপাত না করিয়া শেষ পর্যন্ত উহাকে ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পর্যবসিত করা অনেকেই সমীচীন বলিয়া মনে করেন না।

অনেকের ধারণা রহিয়াছে যে, নামধামসহ যে কোন অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রেরণ করা হইলে উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে, উহার দায়িত্ব বর্তাইবে অভিযোগকারীর উপর। ইহাও ঠিক নয়। প্রচলিত আইন অনুসারে পত্রিকায় যাহা কিছু ছাপা হয় তাহার জন্য প্রধানত দায়ী পত্রিকার সম্পাদক। সংবাদপত্র কোর্ট-কাছারি নয়। অভিযোগকারীর অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহা অনুসন্ধানের জন্য সাক্ষীসাবুদ গ্রহণের ও বিচারের অধিকার তাহাদের নাই। সুতরাং পাঠকদের এই সম্পর্কিত ধারণাও ভুল। অভিযোগ যতই সত্য হউক, তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের গুরুতর ব্যক্তিগত অভিযোগ থাকে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় না। ইহার প্রতিকারস্থল আইন-আদালত।

সংবাদপত্র পরিচালনায় আরও একটি অসুবিধা আছে। অনেক সময় খবরের ভিড়ে ও স্থানের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ খবরও সঠিক মুহূর্তে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ইহা সাধারণত ইচ্ছাকৃত নয়। শেষ মুহূর্তে যিনি বা যাহারা সংবাদ বাছাই করেন, তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির ওপরই এ ব্যাপার নির্ভর করে। সংবাদপত্রের এ সকল অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা জানা থাকিলে যাহারা সমালোচনার স্বার্থে অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমালোচনামুখর হন, তাঁহাদের পক্ষে পাঠকদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব হইবে না।

ইত্তেফাক, ৩১ মার্চ, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

স্বাধীন সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজ

আপনাদের এই মহতী সমাবেশে শামিল হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করার সুযোগ প্রদানের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তবে আমার মনে হয়, আমাকে এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার গুরু দায়িত্ব না দিয়া সম্মেলন কক্ষের এক কোণে বসিয়া যদি আপনাদের জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনা শ্রবণের সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। কারণ, এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার সুকঠিন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার যোগ্যতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চিত নই। তাহা ছাড়া, আমার দৈনন্দিন কর্মধারা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এমন যে, আনুষ্ঠানিকতা পালনে বা কোন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার মত দায়িত্ব পালনে খুব অভ্যস্ত নই। তবু আমার প্রতি যে এই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহাকে আমি একটা অমূল্য সুযোগ বলিয়া মনে করি এবং এখানে অবস্থানকালে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যে সুব্যবস্থা সম্মেলনের কর্মকর্তারা করিয়াছেন, সেই জন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই সম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা করায় আমার জন্য যে দুইটি সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্য আমি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এই বিশেষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে রাজশাহী আগমনের যে ক্ষণিক অবকাশ পাইয়াছি, তাহাতে আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি হইতে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ মিলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই উপলক্ষে আমি আমার দেশের এই অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি লাভের সুযোগ পাইয়াছি, সেই সুযোগ যতই অপর্যাপ্ত হউক না কেন।

সম্বর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজশাহীর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রহিয়াছে; আরও রহিয়াছে ইহার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যার জন্য আমরা সকলে ন্যায্যতই গৌরববোধ করিতে পারি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও রাজশাহীর বিশেষ অবদান রহিয়াছে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই যে, পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলা পত্র-পত্রিকা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

www.pathagar.com

গ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহা কদাচিত উল্লেখ করা হয়। অথচ এই প্রসঙ্গে উর্দু পত্র-পত্রিকার অবদানের কথা ফলাও করিয়া প্রচার করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু রাজশাহী নহে, বাংলার অন্যান্য এলাকা হইতে প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক পত্র-পত্রিকাও পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আমি আশা করি, পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোর যে বিশেষ অবদান রহিয়াছে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে সুধীমণ্ডলী আগাইয়া আসিবেন এবং এই ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করিবেন। ইহাতে একদিকে যেমন মুসলিম গণমানসের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে সুবিধা হইবে, অন্যদিকে তেমনি অতীতের সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলিবে।

শতাধিক বছর আগে সংবাদপত্রকে 'চতুর্থ এস্টেট' হিসাবে উল্লেখ করা একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছিল। পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনুরূপ তিনটি 'এস্টেট' সমবায়ে গঠিত ছিল বলিয়া বলা হইত-'লর্ডস স্পিরিচুয়েল', 'লর্ডস টেম্প্রোরাল' এবং 'কমন্স'। কিন্তু ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ম্যাকলে পার্লামেন্টের গ্যালারীতে উপবিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই রাষ্ট্রের 'চতুর্থ এস্টেট'।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের যে ভূমিকা, তাহার সহিত আর কোন কিছুরই তুলনা চলে না। তবে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রথম প্রয়োজন বাক-স্বাধীনতার; কারণ একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন সংবাদপত্র-জগতই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য অত্যাবশ্যক। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যখন জনগণের হাতে ন্যস্ত, তখন বিজ্ঞতার সহিত সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে সুষ্ঠুভাবে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই ব্যাপারে জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষণে সক্ষম, এইরূপ একটি মাধ্যমের সাহায্যেই এই কাজ সম্ভব এবং সংবাদপত্রই এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য মাধ্যম। যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, রেডিও-টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক আবিষ্কার আজ সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ানোর ফলে এখন সংবাদপত্রের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য কিছুটা পাল্টাইয়া গিয়াছে। এই কথা কেবল অতি উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তবুও বলিতে হয় যে, ব্রিটেন, আমেরিকার মত সর্বাধিক উন্নত দেশগুলিতেও বেতার-টেলিভিশন অপেক্ষা সংবাদপত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আমাদের ন্যায় উন্নয়নকামী দেশে জনমত গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সংবাদপত্রই একমাত্র বাহন হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। তাই দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলিকে আমাদের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসিলের ব্যাপারে অপরিহার্য বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা টমাস জেফারসনের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। একবার তিনি জনৈক সাংবাদিককে লেখেন যে, তাঁহাকে যদি সংবাদপত্রহীন সরকার এবং সরকারহীন সংবাদপত্র জগতের মধ্যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়, তবে তিনি কোন দ্বিধা না করিয়া শেষোক্তটির পক্ষেই মত প্রকাশ করিবেন। গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জেফারসনের এই ছিল ধারণা। পরে তিনি দুইবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন এবং সংবাদপত্র মহলের কঠোর সমালোচনা সহ্য করেন। ইহা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আবার লেখেন, "সংবাদপত্র যেখানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং জনসাধারণ যেখানে পড়িতে জানে, সেখানে সমস্তই নিরাপদ।" মানুষের মধ্যে বহুদিন যাবতই একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য জনসাধারণকে সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই ধারণা বর্তমানে আরও গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ সংবাদপত্র আজ জাতি স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীর মর্যাদা পাইয়াছে। লর্ড ফ্রান্সিস উইলিয়াম-এর মতের সংবাদপত্র স্বাধীনতার অংগ-নয়া ও পুরানো স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের হাতের অস্ত্র, স্বাধীনতার অস্ত্রাগারে রক্ষিত একটি অপরিহার্য অস্ত্র। এই জন্যই গণতন্ত্রকামী এবং গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের নিকট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এত মূল্যবান। আমি একটা কথা ঘোষণা করিতে আনন্দবোধ করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ও উহার আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন এ ব্যাপারে তাঁহাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। কারণ, এ কথা জানা দরকার যে, আমাদের মত দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সর্বদাই অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইব।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, যে নজীরবিহীন ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রামের পর এশিয়া ও আফ্রিকার যে সমস্ত দেশ সদ্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সে সব দেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং কোন কোন দেশে উহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন পত্রিকা অন্ধভাবে কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক না চলিলেই উহাকে শাসকদের কোপানলে পড়িতে হইতেছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বা উহার অস্তিত্ব বিলোপ, এমনকি উহার জন্মরোধ করার জন্য কতই না কারসাজির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়! এভাবেই সরকার যে সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে তাহাদের প্রতিপক্ষ বলিয়া মনে করেন, সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে, যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে, সে সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে জাতীয়করণ করা; তৃতীয়তঃ জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের বাহানা তুলিয়া পত্রিকার প্রকাশনা সরাসরি বন্ধ করিয়া দেওয়া, যদিও এই ক্ষেত্রে অনুরূপ অভিযোগের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হয় না। তাহা ছাড়া, সরকার ঘোষিত তথাকথিত জরুরি অবস্থায় অনেক সাংবাদিককে কারাপ্রাচীরের আন্তরালেও কাল কাটাইতে হয়।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার আরও একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়া থাকেন এবং ইহাই বোধহয় জঘন্যতম পন্থা। এই পন্থায় একদিকে কর্তৃপক্ষ যেমন কোন পত্রিকাকে কোণঠাসা করার জন্য সর্বপ্রকার চাপ দিতে দ্বিধা করেন না, অন্যদিকে পত্রিকাগুলোকে বশীভূত করার জন্য নানা প্রকার প্রলোভনও দেখাইয়া থাকেন। ঢাকার তিনটি কালো তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকাই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরে আমি ইহার বিশদ আলোচনা করিব।

আমি এখন বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহ সর্ব সময়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় উহা উল্লেখ করিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে, স্বাধীনতা অর্জনকালে পূর্ব পাকিস্তানে একটিও দৈনিক পত্রিকা ছিল না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথাশীঘ্র উক্ত শূন্যতা পূরণ করিতে হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকা হইতে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে আমাকে এই কথা উল্লেখ করিতেই হইবে যে, প্রথম হইতে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে সংবাদপত্রশিল্প গড়িয়া তোলার অধিকতর সুযোগ ছিল। এই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রশিল্প সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নাই এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়াও এই শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। ফলে, এখানকার সংবাদপত্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত বিধায় শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিয়াছে।

এইবার বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞাপনই যে সংবাদপত্রশিল্পে আয়ের প্রধান উৎস, উহা সর্বজনস্বীকৃত। যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাওয়ার উপরই যে জাতি-গঠনমূলক এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অস্তিত্ব, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ব্যাপারেও আমাদের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকার সুযোগ-সুবিধা বেশি রহিয়াছে। প্রায় সকল শিল্প ও বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন এজেন্সি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরা অতি সহজেই তাহাদের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহারা অহরহ বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন এজেন্সির সহিত যোগাযোগ করিয়া এবং অন্যান্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া যথেষ্ট বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকেন। বহু দূরে অবস্থিত এই অঞ্চলে থাকি বলিয়া আমরা এই সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত। অনুরূপ যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে অফিস প্রতিষ্ঠা করা অধিক সংখ্যক সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে, সম্প্রতি ঢাকার চারটি দৈনিক পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত কারণসহ ও অন্যান্য কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংবাদপত্রসমূহের আয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উভয় অঞ্চলে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপনের সংখ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই উক্ত বৈষম্য ধরা পড়িবে। কোন কোন

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সংখ্যার পার্থক্য তিন চার গুণ ধরা পড়িবে। সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হারের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা অপরের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের পত্রিকার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত নহি। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহ যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে, সে সব সুযোগ-সুবিধা এখানকার সংবাদপত্রসমূহকেও দেওয়া হউক, ইহাই আমাদের দাবি। যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকাও একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেখানে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাকে শুধু টিকিয়া থাকার জন্য হিমশিম খাইতে হয়। আমি মনে করি, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আঞ্চলিক ভেদ-বৈষম্য ভুলিয়া সংবাদপত্রের উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

আমরা এই দেশের সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নই। হয়তবা সেই জন্য ঢাকার তিনটি বিশিষ্ট পত্রিকা সরকারি ভেদনীতির শিকারে পড়িয়া সরকারি বিজ্ঞাপন হইতে বঞ্চিত। গত মে মাসে কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়াই সরকার এই তিনটি পত্রিকা 'কালো তালিকা' ভুক্ত করিয়াছে। ইহার ফলে এই সকল পত্রিকা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি বিজ্ঞাপন হইতেই বঞ্চিত হয় নাই, পি আই ডি সি, ওয়াপদা, এ ডি সি, ইপি এস আই সি, এফ ডি সি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

এই ব্যবস্থাকে চাপ সৃষ্টির জঘন্য পন্থা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য অতীব পরিষ্কার। পত্রিকাসমূহকে সরকারের বাহনে পরিণত করার জন্যই ইহা করা হইয়াছে। এই নজীরবিহীন স্বেচ্ছাচারণমূলক ব্যবস্থা সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই শুধু খর্ব করে নাই, এই ব্যবস্থায় সাংবাদিকেরাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সামরিক শাসনামলে কর্তাব্যক্তিরা অহরহ সংবাদপত্রের গুণগান করিয়াছেন এবং সব সময়ই 'জাতীয় সংবাদপত্রের' গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছেন। সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর প্রায় সকল পত্রিকাই বিভিন্ন জনমতের প্রতিধ্বনি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে সকল ব্যক্তি সর্বদাই জাতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁহারাই রাতারাতি মত পরিবর্তন করিয়া সেই সকল পত্রিকার নিন্দায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের এই দ্বিমুখী নীতির সারবত্তা প্রমাণের জন্য তাঁহারা এখন বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অতএব, উহা মালিকের মতামতই প্রকাশ করে এবং মালিকের স্বার্থেই কাজ করিয়া থাকে। আমি মনে করি, অনুরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা একটি রাষ্ট্রকে একদল গেঁয়ো লোকের জমিদারীর সহিত তুলনারই শামিল। তাহা ছাড়া, সংবাদপত্রের মালিকানা সম্পর্কে এই সব ভদ্রলোকরা যে যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সংবাদপত্র ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সে পত্রিকায় জনমতের প্রতিফলন না থাকিলে সেই পত্রিকা টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইহা অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতন ব্যবহার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে আমি একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চাই। প্রতিবেশী দেশের এক বিরাট শিল্পপতি কতিপয় সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন,

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর তিনি পত্রিকার নীতি নির্ধারণের কাজে হাত দেন। তাঁহার পত্রিকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁহার কাজে হাত দেন। তাঁহার পত্রিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণ তাঁহার আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হইতে থাকে, পত্রিকায় তিনি অদ্ভুত নীতিও প্রচার শুরু করেন। ফলে, তাঁহার পত্রিকার কাটতিও হ্রাস পাইতে থাকে এবং পরিণামে দুইটি পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। পত্রিকায় জনমতের প্রতিফলন না থাকিলে এমনটিই হয়।

দেশের এই অংশের সংবাদপত্র যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকে, আমি তাহা সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করিয়াছি। পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাকে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সকল সমস্যার টানাপোড়েনে আমি অনেক সময় হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছি এবং পত্রিকাও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কোন কোন সময় চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু খোদাতায়া'লার কৃপায় পত্রিকাটি টিকিয়া আছে। জনগণের উপর আমাদের বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে। বৃক্ষ যেমন মাটি হইতে জীবনীশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সংবাদপত্রও জনগণের উপর বাঁচিয়া থাকে।

পরিশেষে, মফস্বলে কার্যরত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান তাঁর ভাষণে তাঁহাদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। মফস্বল সাংবাদিকদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে চেয়ারম্যান যাহা বলিয়াছেন, আমি তাঁহার সহিত সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত। এই প্রশ্ন সংবাদপত্রের আর্থিক অবস্থার সহিতও একান্তভাবে জড়িত। তাই আসুন, আমরা সকলে সংবাদপত্রের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করি।

আমার সর্বশেষ বক্তব্য, সকল আপদ-বিপদ সত্ত্বেও আমাদের এই পেশা একটি উদ্দীপনাময় পেশা, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই আমাদের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। আমরা বিদ্যাবুদ্ধির অধিকার দাবি করি না; জাতিকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।

ইত্তেফাক, ১২ নভেম্বর, ১৯৬২

www.pathagar.com

সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যা

পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র শিল্প যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, অতীতে তৎপ্রতি আমার আলোকপাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। এতদসত্ত্বেও আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করিয়া আজ যখন আমরা আরও গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি, তখন সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যাগুলোর আশু প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উহা পুনরায় তুলিয়া ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের সংশোধনীর দ্বিতীয় দফা সংশোধন করিবার পর সুষ্ঠু সাংবাদিকতা ও যথাযথ সংবাদ পরিবেশন করিতে হইলে সংবাদপত্রে, বিশেষ করিয়া বাংলা ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে বেশি জায়গার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, শাস্তির বিধান রাখিয়া সরকার বা অন্য কেহ যদি সুষ্ঠু সাংবাদিকতা ও যথাযথ সংবাদ পরিবেশনের প্রশ্নের মনগড়া কোন সংজ্ঞা চাপাইয়া দিতে চাহেন, তবে নীতিগতভাবে আমি তাহার ঘোর বিরোধী। পক্ষান্তরে, আন্তরিকভাবে আমি মনে করি যে, সুষ্ঠু ও সততানিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্বার্থে সরকারপক্ষসহ দল-মত নির্বিশেষে সকল সত্যিকার রাজনৈতিক দল বা সংস্থার মতামত, লক্ষ্য-আদর্শ পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরা সংবাদপত্রের কর্তব্য।

স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, নানা কারণে এযাবৎ অনুরূপ নির্বিচারে মতামত বা সংবাদ পরিবেশন সম্ভব হইয়া উঠে নাই। প্রথমতঃ সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবে সরকারি বক্তৃতা-বিবৃতি বা আলোচনায় পারস্পরিক গালি-গালাজি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার আসক্তি এবং অনুরূপ মতামত বা সংবাদ পরিবেশনে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা, সমঝোতা ও সহনশীলতার অভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রায় বক্তৃতা-বিবৃতিতেই গঠনমূলক প্রস্তাব বা চিন্তাধারার পরিবর্তে গালি-গালাজ স্থান পাইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের পক্ষে যাহা প্রধান অন্তরায়, উহা হইল এই সব পত্রিকার স্থান সংকুলানের অভাব। পূর্ব পাকিস্থানের বাংলা সংবাদপত্রগুলি সাধারণত ছয় পৃষ্ঠার। কোন কোন পত্রিকা সপ্তাহের কোন কোন দিনে আট পৃষ্ঠার আকারে বাহির হইলেও উহার দুই তিন পৃষ্ঠাই বিশেষ একটি বিভাগ হিসাবে প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ সাহিত্য বিভাগ, মহিলা বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ বা কিশোর বিভাগ ইত্যাদি। অর্থাৎ সংবাদপত্র হিসাবে সেগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে তিন পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

সংবাদপত্র। এইভাবে পৃষ্ঠার দিক দিয়া কলেবরে ছোট হওয়া ছাড়াও বাংলা পত্রিকাগুলোতে আরো নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। ইংরেজি পত্রিকার টাইপ অপেক্ষা বাংলা পত্রিকার টাইপের ফেস বড়। স্বভাবতই ইংরেজি হইতে কোন কিছু অনুবাদ করিলে ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যেটুকু জায়গা প্রয়োজন হয়, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলা পত্রিকায় পাঁচ পৃষ্ঠা আদতে ইংরেজি পত্রিকার তিন পৃষ্ঠার সমান। কেননা, ইংরেজি পত্রিকার লাইনে টাইপের ফ্রেম বাংলা টাইপের ফ্রেম-এর তুলনায় অনেক ছোট। অতএব, একথা না বলিলেও চলে যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলেও বাংলা পত্রিকার পক্ষে প্রত্যেক সংবাদ বা বিবৃতি প্রকাশের ব্যাপারে পুরাপুরি সুবিচার করা সম্ভব হয় না।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। পাকিস্তানের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর দপ্তর এবং সরকারের কেন্দ্রীয় অফিসগুলোও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সংবাদের প্রধান উৎস বলিতে গেলে সবই সেখানে। পশ্চিম পাকিস্তানে যখন রাত বারটা তখন পূর্ব পাকিস্তানে রাত ১টা। বিভিন্ন মোকামে সময়মত পত্রিকা পৌঁছাবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রেসে শেষ কপি দিবার শেষ সময়ও এই রাত ১টা। এদিকে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অনুবাদের প্রশ্ন জড়িত থাকায় এই শেষ সময়ের মধ্যে কপি দিতে হইলে প্রায় ক্ষেত্রেই রাত্রি ১২ টার মধ্যে বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ আসিয়া পৌঁছে কেবল উহাই পরিবেশন করা সম্ভব হয়। উহার পরে প্রাপ্ত সংবাদ পরিবেশনের অর্থ কতকগুলো মোকামে ঐ দিন পত্রিকা না পৌঁছানোর ঝুঁকি লওয়া। আবার এই ঝুঁকির অর্থ আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

অপরপক্ষে উপরোক্ত কারণে বাংলা পত্রিকায় আজ যে সংবাদ বা বিবৃতি (তাহার যত গুরুত্বই থাকুক না কেন) প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, পরের দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় বংলা পত্রিকার জন্য উহা বাসি হইয়া যায়। এইসব অসুবিধার দরুন প্রথম দিনেই ছাপিবার জন্য বাংলা পত্রিকায় অতিসত্বর প্রত্যেকটি সংবাদ ও বিবৃতিই মারাত্মক রকমের কাটছাঁট করিয়া প্রকাশ করিতে হয় এবং প্রয়োজনের তাগিদে কাটছাঁট করিতে গিয়া কখনও কখনও সংবাদ বা বিবৃতিবিশেষ যে বিকৃতি দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই আমি বলিতে পারি যে, এই কারণেই আমাদের পক্ষে কাহাকেও সন্তুষ্ট করা আজও সম্ভব হয় নাই। এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা যাহাদের মতাদর্শের সমর্থক বলিয়া কথিত তাহাদিগকেও নহে।

স্বভাবতই দেশে সুষ্ঠু সাংবাদিকতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে সংবাদপত্রের বিশেষ করিয়া বাংলা পত্রিকার পৃষ্ঠা বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য। অথচ এই পৃষ্ঠা বাড়ানোর মতো নিউজপ্রিন্টের মূল্য, কর্মচারীদের বেতন, মেশিনপত্র, ছাপা খরচ প্রভৃতি সবকিছু মিলাইয়া সামগ্রিক ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির প্রশ্নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি, কোন পত্রিকার কলেবর মাত্র দুই পৃষ্ঠা বাড়াইতে হইলেও প্রতি মাসে প্রায় ২০,০০০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি অবধারিত। স্বভাবতই, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা পত্রিকার আর্থিক সামর্থ্য-অসামর্থ্যের প্রশ্নে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

www.pathagar.com

সকলেই জানেন যে, বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্র শিল্পের আয়ের প্রধান উৎস। পত্রিকার সার্কুলেশন কেবল সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনের মূল্যের উচ্চহার প্রাপ্তির সহায়ক। কোনক্রমেই উহার মুনাফা নির্দেশক নহে। বরং পত্রিকার সার্কুলেশন যখন একটি বিশেষ কোঠায় গিয়া পৌঁছে তখন এই সার্কুলেশনই আবার পত্রিকার পক্ষে লোকসানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অতীতেই আমি দেখিয়াছি যে, যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের আয়ের অন্যতম উৎস সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানী পত্রিকগুলো সবসময়ই এক প্রতিকূল অবস্থা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানী পত্রিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্যের সর্বোচ্চ হার যে ক্ষেত্রে প্রতি কলাম ইঞ্চি ৬ টাকা, সে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার জন্য এই সর্বনিম্ন হার হইল ১৬ টাকা।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ে, ওয়াপদা, আই ডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি সংস্থার বিজ্ঞাপন পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাসমূহে পরিবেশিত হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ কোন সংস্থার বিজ্ঞাপন পূর্ব পাকিস্তানের কোন পত্রিকায় দেওয়া হয় না।

তৃতীয়তঃ যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান শিল্পের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন এজেন্সী করাচিতে অবস্থিত, সেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের, এমনকি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা সমূহও অনেক কম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এবং বিজ্ঞাপনের মূল্যহারের বিরাট পার্থক্যের দরুন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীভুক্ত পত্রিকার আয়ের ক্ষেত্রে বরাবরই বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। হয়ত বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি পত্রিকার সার্কুলেশন পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকা অপেক্ষা বেশি। কথাটা বর্তমানে সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে আছে, গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪-৫৫ সালের দিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকার সার্কুলেশনের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য ছিল না। আজ যদি এই পার্থক্য বেশি হইয়া থাকে, তবে তাহার কতিপয় কারণও আছে। আমার মতে এই কারণগুলো হইল ঃ (১) পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাসমূহ সরকারি ও বাণিজ্যিক উভয় সূত্রেই বেশি বিজ্ঞাপন পাইয়া আসিতেছে। তদুপরি তাহাদের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার অন্তত তিন গুণ। (২) বিজ্ঞাপন খাতে লব্ধ সংবাদপত্রগুলো নতুন নতুন আধুনিক মেশিনপত্র আমদানি করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, যাহা পরবর্তী পর্যায়ে তাহাদের সার্কুলেশন বৃদ্ধিরও সহায়ক হইয়াছে। অথচ বিজ্ঞাপন খাতে পর্যাপ্ত আয় ও অন্যান্য সুবিধার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলোকে আজও তাহাদের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখার সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইতেছে।

অবশ্য মেশিনপত্র আমদানির লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যাপারে নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি কিছুকাল যাবৎ অপসারিত হইলেও আর্থিক অসচ্ছলতা পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকার ছাপাখানা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের পথে বিরাট অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যাপারটাও অনেকটা সহজ করা হইলেও ইহা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, কোন

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা অর্জনের সামর্থ্য না থাকিলে এবং পত্রিকাটি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী না হইলে কোন ব্যাংকই তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ মঞ্জুর করিতে আগাইয়া আসে না। ঋণ পাইতে হইলে সংবাদপত্রের স্থায়িত্ব ও মুনাফা অর্জনের সামর্থ্য থাকিতে হইবে। এইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে সরকার সম্প্রতি সংবাদপত্রের উপর যেসব বিধি-নিষেধ জারি করিয়াছেন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ছাপাখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করার যে বিধান উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহাতে কোন সংবাদপত্রকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাংক অতঃপর আরো বেশি ইতস্তত করিবে।

নিউজপ্রিন্টের বর্তমান মূল্যও দেশের সংবাদপত্র শিল্পের পক্ষে একটি বিরাট বোঝাবিশেষ। দেশী নিউজপ্রিন্ট বাবদ এখন যে মূল্য দিতে হইতেছে, উৎকৃষ্ট ধরনের বিদেশী নিউজপ্রিন্টের তুলনায় উহা শতকরা অন্তত ১৫ ভাগ বেশি। নিউজপ্রিন্টের এই মূল্য হ্রাসের জন্য এবং বেশি না হইলেও অন্তত বিদেশী নিউজপ্রিন্টের সমান করিবার জন্য আমরা বরাবরই কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন ফল হয় না।

এইসব সমস্যার উপর আবার বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ রহিয়াছে। বেতন বোর্ডের এই রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কেননা আমি বিশ্বাস করি, সংবাদপত্র শিল্পের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য উহার কর্মচারীদের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেওয়া প্রয়োজন। তবু দুঃখের সহিত আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বিচারপতি সাজ্জাদ খানের নেতৃত্বে গঠিত বেতন বোর্ড সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণের ব্যাপারে সঙ্গতি সাধন ও নিউজপ্রিন্টের মূল্য সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, সরকার উহা আজও গ্রহণ করেন নাই।

বেতন বোর্ডের রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে এ প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। রিপোর্টে বলা হয়, "আয় ও সার্কুলেশন হইল পত্রিকার প্রাণ। সমৃদ্ধিশালী পত্রিকার পক্ষে অসংখ্য পাঠকের নিকট হইতে তাম্রমুদ্রা প্রাপ্তি যেমন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য অসংখ্য বিজ্ঞাপনদাতার প্রদত্ত বিপুল অর্থ। ইহার একটি যে পত্রিকার নাই, অপরটি সংগ্রহ করা সে পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নহে। স্বভাবতই সে পত্রিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার সার্কুলেশন ও গ্রস আয়ের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বিরাট; যেমন কোন পত্রিকার সার্কুলেশন ৬৫ হাজার আবার কোন পত্রিকার মাত্র কয়েক শত। আয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কোন পত্রিকার বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার কোঠায়, আবার কোন পত্রিকার মাত্র কয়েক হাজার। এইভাবে পাকিস্তানের পত্রিকা জগতে একদিকে আমরা যেমন চরম আর্থিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি, অনদিকে তেমনি লক্ষ্য করিয়াছি প্রায় দেউলিয়াত্ব।"

শীর্ষস্থানীয় দুইটি জাতীয় বাংলা দৈনিকের অবস্থা সম্পর্কে বোর্ড মন্তব্য করেন যে, ইহার মধ্যে একটি দৈনিকের গ্রস আয় বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। বিজ্ঞাপনের মূল্য হ্রাসের বিরাট বৈষম্যের প্রশ্নে, বিশেষ করিয়া সার্কুলেশনের তোয়াক্কা না করিয়া ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মূল্য হ্রাসের দ্বারা বর্তমানে যে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে স্থানীয় ভাষার পত্রিকা মালিকদের সযত্নে পোষিত অভিযোগের প্রশ্নেও আমরা কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত সরকার বেতন বোর্ডের অনুরূপ কোন সুপারিশ কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই; বরং ভিন্ন কারণে গত ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস হইতে দৈনিক ইত্তেফাক, পাকিস্তান অবজার্ভার ও সংবাদে সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার যাবতীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত, বেতন বোর্ড পাকিস্তানের যে ১১টি পত্রিকাকে মেট্রোপলিটান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রাখেন, পাকিস্তান অবজার্ভার ও ইত্তেফাক উহার অন্যতম।

এদিকে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার প্রশ্নে বেতন বোর্ড যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কার্যকরী করায় সংবাদপত্রের ব্যয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে ব্ল্যাকলিস্টিং ও পত্রিকার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অপরদিকে বিজ্ঞাপন বন্টনের সংগতি বিধান, বিজ্ঞাপনের মূল্যহার বৃদ্ধি ও নিউজপ্রিন্টের মূল্য হ্রাসের প্রশ্নে বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ কার্যকরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব— সব মিলাইয়া কোন কোন সংবাদপত্র, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহ মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, বেতন বোর্ডের রোয়েদাদে সরকারের করণীয় সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার পুরাপুরি বাস্তবায়ন সরকারের ক্ষমতার বাহিরে নহে। সরকার যদি যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন বা অন্য কোন ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিত না। বেতন বোর্ড সংবাদপত্র শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত যথার্থভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশের জন্য বর্তমানে প্রয়োজন শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র, ভীতচকিত বশংবদ ও আর্থিক দিক দিয়া অনির্ভরযোগ্য পত্রিকা নহে। বস্তুত, শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রিকার চিত্তচাপল্য, দায়িত্বহীনতা ও অহেতুক রোমাঞ্চপ্রবণতা সভ্য সমাজসুলভ মূল্যবোধ নস্যাৎ করিয়া দেয়।

বেতন বোর্ড সংবাদপত্রের এই যে লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহেই ইহা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে কেবল তখনই, যখন সরকারও তাঁহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। সরকার যদি উপরে বর্ণিত অসুবিধা ও বৈষম্যাদি দূরীকরণের জন্য আগাইয়া আসেন, তবে অবাধ সততাপরায়ণ ও নিরক্ষেপ সাংবাদিকতার সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদপত্রও যে তাহাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করিবেন, এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আজ যখন সরকারও সংবাদপত্র মালিক গড়িয়া তুলিতে সমান আগ্রহী, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করিব যে, সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যাবলির প্রতিকারার্থেই সরকার কালক্ষেপ করিবেন না।

পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সংবাদপত্রের অভাব-অসুবিধা সম্পর্কে উপরে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, ইংরেজি হইলেও ঢাকার দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার-এর বেলায়ও উহা কম-বেশি প্রযোজ্য। গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়া একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের ইংরেজি পত্রিকাগুলো যেক্ষেত্রে ১০ হইতে ১২ পৃষ্ঠার, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান অবজার্ভারের পক্ষে

www.pathagar.com

আজও ৮ পৃষ্ঠার উপরে যাওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কারণ পত্রিকাটিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বিজ্ঞাপন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এমনকি, যে সময় পত্রিকাটি সরকারি বিজ্ঞাপন পাইত, সে সময়ও উহার বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার বাংলা সংবাদপত্রের সমান ছিল। অথচ অনেক কম সার্কুলেশনের পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাকে তখন বিজ্ঞাপনের উচ্চ হার দেওয়া হইত।

শেষত, সংবাদপত্র শিল্প সম্পর্কে মহলবিশেষে যে ভুল ধারণা রহিয়াছে, সে প্রশ্নে আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। প্রভাবশালী মহলে আমি এমন আলোচনা শুনিয়াছি যে, সংবাদপত্রের মত শক্তিশালী মাধ্যম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। যুক্তির অসারতা নির্দেশ করিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন করে না। সংবাদপত্র জনমতের বাহন। স্বভাবতই জনসাধারণের সমর্থনের উপরই উহার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সংবাদপত্র অপেক্ষা আরও অধিকতর শক্তিশালী হাতিয়ার হইল দেশের শাসনযন্ত্র। যে কোন পদ্ধতির সরকারের অধীনে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দ্বারাই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এমনকি, পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনেও প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রী নামের মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তিই দেশ শাসন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে জনমত ও জনস্বার্থের প্রতি মন্ত্রী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নজর রাখিয়া চলিতে হয় এবং ইহাতেই শাসনযন্ত্রের নিরাপত্তা নিহিত। অনুরূপভাবে সংবাদপত্রকেও জনসমর্থনের উপরই বাঁচিয়া থাকিতে হয়। স্বভাবতই জনমত, জনস্বার্থ বা গণমনের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সংবাদপত্র উদাসীন থাকিতে পারে না। কেননা, সে উদাসীনতার অর্থ পত্রিকার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ লোপ। আর এই আকর্ষণ লোপের অর্থ পত্রিকার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ সমগ্র জাতি বা এমনকি পরিষদের পক্ষেও যেমন দেশের দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নহে, তেমনি সমগ্র জাতি বা কোন জনসমষ্টি অথবা বারংবার পরিবর্তনশীল কোন পরিচালন ব্যবস্থায় সংবাদপত্র পরিচালনা করা সম্ভব নহে।

ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর, ১৯৬৩

www.pathagar.com

একটি অপূরণীয় ক্ষতি

যে আহমেদুর রহমান "ভীমরুল" সম্পাদকীয় বিভাগে আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, যে আমার চিন্তাধারাকে আমার অপেক্ষাও স্বচ্ছ বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করতে পারত, সেই আহমেদুর রহমান ইত্তেফাকে আর লিখবে না। সে আর ইহজগতে নেই, এ কথা ভাবতে আমার মন কতখানি ভারাক্রান্ত, ভাষায় তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার পরম আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে আমি যতখানি ব্যথাভিভূত হই, আহমেদুর রহমানের তিরোধানে আমি তদপেক্ষাও অধিক বেদনা পেয়েছি।

তরুণ আহমেদুর রহমান আগে কখনো বিদেশে যায় নি। এমনকি, পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার সুযোগও তার ভাগ্যে জোটেনি। সম্প্রতি তার রাশিয়া যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পাসপোর্ট না পাওয়ার দরুন তার রাশিয়া গমন সম্ভবপর হয় নি। এবার যখন পি-আই-এর উদ্বোধনী ফ্লাইটে কায়রো গমনের আমন্ত্রণ আসল, তখন আমিই তার নাম প্রস্তাব করলাম। প্রথম দিকে সে বেশ উৎসাহবোধ করল, কিন্তু মাত্র দুই দিনের জন্য কায়রো সফর জেনে সে তার উৎসাহ অনেকটা হারিয়েছিল বলে মনে হলে আমিই তাকে বলেছিলাম যে, এ উপলক্ষে অন্তত তাহার পাসপোর্টের একটা হিল্লা হবে এবং তার বিদেশ গমনের পথ খুলবে। বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনার পর আমার মনে হচ্ছে, তার প্রতি আমার স্নেহ, ভালবাসা এবং তাকে বিদেশ প্রেরণে আমার আগ্রহই যেন তার অকাল-মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অনন্য প্রতিভাধর তরুণ সাংবাদিক আহমেদুর রহমানের অকালমৃত্যু পাকিস্তানের সাংবাদিকতার যে ক্ষতি সাধন করেছে তার তুলনা নেই। আহমেদুর রহমানকে হারিয়ে 'ইত্তেফাক' এমনই একজন নিষ্ঠাবান ও শক্তিশালী লোককে হারিয়েছে, যা কোন কালেই পূরণ হবার নয়। আহমেদুর রহমানের লেখনী-শক্তি ও প্রকাশভঙ্গি ছিল অপূর্ব। এ তরুণ বয়সে সে যে জ্ঞানের অধিকারী ছিল, তা এ দেশে বিরল। কিন্তু বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনদিন অহঙ্কার-অহমিকা লক্ষ করি নি। আহমেদুর রহমান কেবল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি সে একজন সুসাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীও ছিল। তদুপরি, সে ছিল একজন নীরব রাজনৈতিক কর্মী। তার মধ্যে যে নীতিনিষ্ঠা এবং সত্যিকার জনসেবার মনোভাব লক্ষ করেছি, তাও আজিকার সুবিধাবাদী সমাজে এক বিরাট স্বাতন্ত্র্যধর্মী বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে সে ইত্তেফাকে যোগদান করে। তার আগে সে অন্যান্য কাগজে কাজ করত। তার আগ্রহ ছিল ইত্তেফাকের মতন একটা বহুল প্রচারিত পত্রিকায় লেখা, যাতে তার লেখা ও চিন্তাধারা অধিকাংশ লোকের নিকট পৌঁছাতে পারে। তার এ আগ্রহের কথা শুনেই তাকে ইত্তেফাকে গ্রহণ করা হয়। সেই সময় থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছে। 'ইত্তেফাক' বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই সংগ্রামে আহমেদুর রহমান ছিল আমার অন্যতম প্রধান সহকর্মী। ১৯৬২ সালে যখন ইত্তেফাকের উপর হামলা আসে তখন তার উপরও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। সুদীর্ঘ দশ মাস আত্মগোপন করে থাকার সময় ইত্তেফাকের প্রতি তার আনুগত্য অবিচল ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই ইত্তেফাকের কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য দেন-দরবার করেছে। কিন্তু আহমেদুর রহমান একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হয়েও কোন দিন মুখ খুলে টাকা-পয়সার প্রশ্নে আমাকে কিছু বলে নি; বরং সাম্প্রতিককালে ঢাকার কোন কোন পত্রিকা থেকে তাকে অধিক বেতন দেওয়ার প্রস্তাব করা হলেও সে এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ তো করেই নি, এমনকি সেই কথা ঘুণাক্ষরেও আমার কানে পৌঁছায় নি। আমার অন্যান্য সহকর্মীর কাছ থেকে শুনেছি যে, আহমেদুর রহমান নিজেই বলেছে আমার একার বেতন বৃদ্ধি করা হলে অন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে; আর সকলের বেতন বৃদ্ধি করতে হলে, এ বোঝা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে না। কায়রো গমন উপলক্ষে তার কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল, সে-কথাও আমাকে সে সরাসরি জানায় নি। মাঈদুল হাসানের মাধ্যমেই তার এ প্রয়োজনের কথা আমি শুনতে পাই। এ যুগে এ ধরনের উদার প্রকৃতির মানুষ বিরল।

দেশের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনে আহমেদুর রহমানকে আমি কখনো বিচলিত হতে বা ভেঙে পড়তে দেখি নি। জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে শুধু আশাবাদীই ছিল না, লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কেও তার সুনির্দিষ্ট মত ও পথ ছিল। বাংলার মাটি ও বাংলার মানুষকে সে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। বাঙালির শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা লক্ষ করে সত্যই তার প্রাণ কাঁদত। অভিভাবকহীন অবস্থায় ছাত্র-জীবন থেকে যে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছিল, সেইভাবে সমগ্র বাঙালি জাতি একদিন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এটিই ছিল তার বলিষ্ঠ আশাবাদ। বাঙালির প্রতি তার এ অপরিসীম একান্ত দরদ ছিল বলেই সে যে অপর মানুষকে ভালবাসত না, অপরের দুঃখে ব্যথিত হতো না, তা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি তার এ একইরূপ দরদ ছিল। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার যে অঞ্চলেই মানুষের উপর নির্যাতন ও শোষণ চলেছে, তার বিরুদ্ধে সে তার শক্তিশালী লেখনী চালিয়েছে। তবে বাংলার সন্তান হিসেবে বাঙালিদের সে আপনজন হিসেবে গণ্য করেছে, তাদের দুঃখ-দৈন্যকে সে নিজের দুঃখ-দৈন্য বলে বিবেচনা করেছে।

আহমেদুর রহমান আর আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে না। তার সেবা হতে শুধু ইত্তেফাক নয়, দেশবাসীও বঞ্চিত হয়েছে। আজ আমরা যে তার বহুমুখী গুণাবলির প্রশংসা করছি তাও তার কানে পৌঁছাবে না। আহমেদুর রহমানের মতন নিষ্ঠাবান ও বলিষ্ঠ মতবাদের তরুণদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা শত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আশাহত হই নি। তাই সে তার সংক্ষিপ্ত অথচ সফলতাময় জীবনে যে সততা, সাধনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে, আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ তরুণেরা তার পথ অনুসরণ করলে, উহা হবে আহমেদুর রহমানের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাকে জাতির স্মৃতিপটে অমর করে রাখবার প্রধান অবলম্বন। অমলিন চরিত্র আহমেদুর রহমানের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। পূর্ব বাংলার বুকে আহমেদুর রহমানের মতন শত শত আদর্শবাদী যুবকের জন্ম হোক, এটিই আমার প্রার্থনা।

ইত্তেফাক, ২২ মে, ১৯৬৫।

www.pathagar.com

গণকল্যাণের রাজনীতি

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করার জন্য আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমার জন্য এটা একটা সম্মানের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল আছেন। প্রায় এক মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর আমি বাসায় ফিরলেও চিকিৎসকেরা আমাকে অন্তত তিন মাসের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাই সশরীরে আপনাদের অধিবেশনে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না বলে আমি দুঃখিত।

আমি সক্রিয় রাজনীতি হতে বহুদিন থেকে দূরে আছি, তাও আপনারা জানেন। সাংবাদিকতার প্রতি সুবিচার করতে হলে আমাদের মতন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের পক্ষে একই সময় সাংবাদিকতা ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা চলে না। সেই জন্যই ১৯৫৩ সাল থেকে আমি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য নই। অবশ্য আপনাদের অনেকের সাথেই আমার সম্পর্ক বহুদিনের এবং ঘনিষ্ঠ। আমরা একত্রে যেমন দুঃখ-দৈন্য, জেল-জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করেছি, তেমনি চিন্তার দিক দিয়েও আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী। এতদসত্ত্বেও অতীতে আপনাদের কাউন্সিল অধিবেশনে বা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুরুদ্ধ হয়েও আমি যোগদান করিনি। এবার আপনাদের তরফ থেকে প্রস্তাব আসতেই আমি সম্মত হয়েছি শুধুমাত্র একটি কারণে।

আজ প্রায় আড়াই বছর যাবৎ আমার কলম বন্ধ। আমার আজীবনের সাধনা "ইত্তেফাক" আজ নেই। আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। সক্রিয় জীবনে আর ফিরে আসতে পারব কিনা জানি না। তাই আপনাদের এই সম্মেলন উপলক্ষে দু'একটি মনের কথা প্রকাশ করার সুযোগ পাব, এই আশায়ই মূলত আপনাদের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি। ভগ্নস্বাস্থ্য এবং নিঃস্ব হলেও আমি আমার মনোবল এবং গণমানুষের উপর আস্থা হারাইনি। যদি নিজের জীবনকালে আমি আমার আশা ও বিশ্বাসের সফল রূপায়ণ দেখে যেতে নাও পারি তবু এই সান্ত্বনা নিয়েই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব যে, দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার উপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থার অমর্যাদা আমি ঘটাইনি।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, A gentleman is what his tailor makes of him. দর্জি যদি একজন ভদ্রলোক তৈরি করতে পারে, তা'হলে একটি দেশও যথার্থ অর্থে তৈরি হয় সাধারণ মানুষের হাতে, অতিমানুষের হাতে নয়। ইতিহাসের

www.pathagar.com

নিয়ন্তা এই সাধারণ মানুষ। তাই সাধারণ মানুষকে পাশ কাটিয়ে যে রাজনীতি, তাকে আমি রাজনীতি বলে গণ্য করি না। আপনারাও যে করেন না, তার প্রমাণ আপনাদের আজকের এই সম্মেলন। রাজনীতি দূষণীয় নয় বরং একটি পবিত্র ব্রত। দেশের এবং দেশের মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাই এই ব্রত গ্রহণে প্রেরণার উৎস। রাজনীতিকে যারা আত্মোন্নতি বা ভাগ্যোন্নয়নের অবলম্বন বলে ভাবেন, তাদের উচিত ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া, কন্ট্রাকটারী করা, লাইসেন্স পারমিটের জন্য উমেদারি করা; রাজনীতি করা নয়। রাজনীতির একটিমাত্র অপাপবিদ্ধ উদ্দেশ্য, দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণ সাধনের পথ বিঘ্নসঙ্কুল। দমন ও পীড়নের খড়্গ এই পথে নিত্য উদ্যত। গতানুগতিক বা প্রথাসিদ্ধ রাজনীতি নয়, সত্যিকারের এই রাজনীতির, এই বিঘ্নসঙ্কুল পথের যাঁরা অভিযাত্রী তাঁরা মহাপ্রাণ, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। ক্ষুদ্র স্বার্থে বিচারবোধ বা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ পণ্ডিতি বুদ্ধি ও চুলচেরা তর্ক দ্বারা তাঁদের কল্যাণবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের পরিমাপ সম্ভব নয়।

গণকল্যাণের রাজনীতি আর ক্ষমতার রাজনীতি এক নয়। রাজনীতি সুনিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা লাভের উপায়, কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। যারা রাজনীতিকে উদ্দেশ্য করে তোলে তারা ক্ষমতার রাজনীতি করে; গণকল্যাণের রাজনীতি করে না। কিন্তু আপনারা সেই রাজনীতির পথ বেছে না নিয়ে যে গণকল্যাণের পথ বেছে নিয়েছেন এবং দুঃখ ও ত্যাগের সকল অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার মনোবল দেখিয়েছেন, এখানেই আপনারা সৌভ্রাতৃত্বের একই রাখী-বন্ধনে বাঁধা। যদিও সাংবাদিকতার জীবন গ্রহণের পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে আমি দূরে ছিলাম, তথাপি রাজনীতি থেকে মুক্ত ছিলাম, এমন অলীক দাবি আমি করি না। আপনারা যে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কর্মী ও নেতা, সেই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও বিকাশের ধারার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড়।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের জন্ম; দেন-দরবারের থালা বয়ে বেড়াবার জন্য নয়; কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থের পোষকতা করার জন্যও নয়। একটি সদ্যস্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও মজবুত করার জন্য বিরোধীদলরূপে আওয়ামী লীগের জন্ম। গণতন্ত্রের প্রসার মানেই গণস্বার্থ ও অধিকারের ভিত্তি মজবুত হওয়া। আওয়ামী লীগের জন্ম এই গণঅধিকারের অতন্দ্র প্রহরীরূপে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি সদ্যস্বাধীন দেশে গণ-অধিকার সংরক্ষণের এমন কী তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রাজনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন, পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দুটি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল রাজনৈতিক প্লাটফর্ম মাত্র। এই প্লাটফর্মে জমায়েত হয়েছিলেন নানা শ্রেণীর, নানা স্বার্থের নানা পেশার লোক। সকলেরই সাধারণ লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ কিন্তু তাদের অনেকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ আমি মুসলিম লীগের কথাই তুলে ধরতে পারি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই মুসলিম লীগকে অর্থ সাহায্য যুগিয়েছেন উদীয়মান মুসলিম ধনিক ও বণিক শ্রেণী। তাঁরা

www.pathagar.com

ভেবেছিলেন, পাকিস্তান অর্জিত হলে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতিযোগিতামুক্ত হয়ে তাঁরা হবেন সর্বেসর্বা। মুসলিম লীগকে সমর্থন যুগিয়েছেন তদানীন্তন ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম আমলাতন্ত্র। তাঁরা দেখেছেন, পাকিস্তান হলে তাঁদের উন্নতি ও ক্ষমতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। আর আমরা যারা ছিলাম মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মী, সাধারণ সমর্থক, এদেশের হাজার হাজার কোটি কোটি নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ— আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তান মানেই আমাদের শোষণ ও পীড়নের অবসান, নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের, নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার অর্জন ও অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা লাভ। পাকিস্তানের জন্য তাই কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সেদিন চরম দুঃখ ও ত্যাগ বরণে পশ্চাদপদ হয়নি। পুলিশের গুলীতে তারা প্রাণ দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, বাস্তুভিটা হারিয়ে পথের কাঙ্গাল হয়েছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইয়ের রক্তদান, চরম স্বার্থত্যাগ, হাজার হাজার মা-বোনের অশ্রু ও ইজ্জতের বিনিময়ে যে পাকিস্তান আমরা অর্জন করেছি, তাতে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী" কিংবা তাতে আমলাতন্ত্রের বাদশাহী কায়েম হবে, বিশ্বাস করুন, এমন প্রত্যাশা আমরা করিনি।

কিন্তু আমরা ভুল করেছিলাম। প্লাটফর্মকে আমরা ভেবেছিলাম রাজনৈতিক দল। যে রাজনৈতিক বহুমুখিতার মধ্যে সমাজের শ্রেণী স্বার্থের সমন্বয়, তাকে বর্জন করে একমুখিতাকে ভেবেছিলাম জাতীয় ঐক্য। ভাষা-সংস্কৃতি, খাদ্যাখাদ্য এবং ভৌগোলিক পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র ধর্মীয় আবেদনের মধ্যে ভেবেছিলাম আমাদের জাতীয় সমস্যার সব সমাধান নিহিত। দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থ এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে কার্পণ্য করেনি। রোগশয্যায় শুয়ে কারো প্রতি অসূয়া বা বিদ্বেষবশত ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করব, এমন প্রবণতা আমার মধ্যে নেই। আজ জীবনের এই প্রদোষ বেলায় পৌঁছে যখনই অতীতের পানে পিছন ফিরে তাকাই, তখনই মনের মুকুরে একটিমাত্র প্রশ্নই বার বার ভেসে ওঠে, "আমরা কি এ জন্যই পাকিস্তান চেয়েছিলাম?" নিজের মনের সমকালীন ইতিহাসের আলোকে আমি এই প্রশ্নের বার বার যে জবাব পেয়েছি, নিজের জ্ঞান-বিবেক ও বিশ্বাসমত তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। আমার দেখাটা ভুল হতে পারে, আমার বোঝাটাও ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনীতির এই বিভ্রান্তিকর ইতিহাসে আমার অভিজ্ঞতা যদি বিভ্রান্তি নিরসনে সামান্যতম সূত্র হিসেবেও বিবেচিত হয়, তাই হবে আমার আন্তরিকতার সঠিক ও সত্য মূল্যপ্রাপ্তি।

আমি আগেও বলেছি গণকল্যাণের রাজনীতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। স্বাধীনতার সেই ঊষালগ্নেই এই সত্যটা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত ছিল। এই ভুলের খেসারতই আমরা দিয়ে যাচ্ছি দীর্ঘ বিশ বছর ধরে। বিদেশী শাসকেরা আমাদের জন্য একটা ফাঁদ পেতেছিলেন। দুশো বছরের শাসনে তারা আমাদের শাসন-কাঠামোতে তাদের একদল বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তৈরি করেছিলেন। দুশো বছর এই বিশ্বস্ততা ও সেবার প্রতিদান এই প্রতিনিধিরা পাবে, এ তো স্বাভাবিক। এই বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কারা, আপনারা তা জানেন। আমাদের রাজনীতিকরা সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু এই বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের স্বরূপ তাঁরা তখন চিনে উঠতে পারেননি। এমনকি, তাঁরা বিদেশী শাসকসৃষ্ট শাসন-কাঠামো পরিবর্তনের

www.pathagar.com

চেষ্টাও করেননি। ফলে, স্বাধীনতা এলো, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জন্য ব্রিটিশের ফাঁদও পাতা রয়ে গেল। এই ফাঁদে রাজনীতিকেরা বার বার পা দিয়েছেন। প্রথমে ধিক্কৃত হয়েছেন তাঁরা; তারপর ধিক্কৃত করার চেষ্টা হয়েছে গোটা রাজনীতিকে। সে রাজনীতি গণকল্যাণের রাজনীতি। জাতীয় জীবন থেকে গণকল্যাণের রাজনীতিকে গলা ধাক্কা দিয়ে যে ক্ষমতাভিসারী রাজনীতির পত্তন করা হয়েছে তথাকথিত গণতন্ত্রের টোপর পরিয়ে, বিশ্বাস করুন, আমি যেন আজও তার মধ্যে ব্রিটিশের পাতা সেই ফাঁদের, সেই গোপন চক্রান্তের খেলাই দেখতে পাচ্ছি। এই খেলার লক্ষ্য, আমাদের স্বাধীনতার সাফল্যকে ব্যর্থ করা, রাষ্ট্রীয় জীবনে গণ-মুক্তি ও গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা। দেশ শাসন যাঁরাই করুন, রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কলহ-কোন্দল যতই থাকুক, জনগণের উপর কোন শাসকবর্গের পক্ষেই আস্থা হারানো বা চালাকি চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ বিধেয় নয়। বর্তমান শাসকবর্গ মৌলিক গণতন্ত্র নামে যে ব্যবস্থাটি দেশে প্রচলন করেছেন, তা জনগণের মনঃপুত কিনা এবং অধিকাংশ দেশবাসী তা সমর্থন করেন কিনা, এই প্রশ্নের ফয়সালা আমরা দেশবাসীর বিচার-কাঠিতে গণতান্ত্রিক পন্থায়ই করতে পারি। কিন্তু তা না করে তার পরিবর্তে মৌলিক গণতন্ত্রের অনুকূলে সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য ক্ষয়িষ্ণু ধিক্কৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে আমরা ধর্ণা দেই কেন? কেন আমরা টয়েনবির নিকট থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করি? কেন আমরা রাসব্রুক উইলিয়ামসের পিছনে পয়সা ব্যয় করি? গ্রন্থ রচনা করিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা চালাই? একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে এটা কি আমাদের জন্য লজ্জার নয়?

আমি বিশ্বাস করি, এই দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত। আপনাদের সকল নীতি ও কার্যক্রমের সঙ্গে আমি হয়ত একমত নই, তবুও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের জাতীয় জীবনকে কায়েমী স্বার্থের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আওয়ামী লীগ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ আগেও সর্বাধিক ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছেন, এখনো করছেন। আওয়ামী লীগের সাথে যাদের মতভেদ ও মতানৈক্য রয়েছে, তাদেরও এই সত্য স্বীকার করা উচিত। আজও যারা কোন ব্যক্তিস্বার্থে নয়, দেশের ও জাতির স্বার্থে এবং দেশের মানুষের স্বার্থে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, পারিবারিক নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করছেন, তাঁদের মত ও পথের সঙ্গে আমরা একমত হতে না-ও পারি, কিন্তু তাঁদের ত্যাগের দৃষ্টান্ত, সাহস ও মনোবলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য রাজনীতির প্রকাশ্য মঞ্চেই মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর বাইরে দলমত নির্বিশেষ আমরা সকলেই একই পথের যাত্রী। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্তি আছে, বিভেদ আছে, বিতর্ক আছে, এমনকি বিচ্ছেদও আছে, কিন্তু সাধারণ লক্ষ্যের স্বার্থে সেসব আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত। আর তা না হলে, অন্তত পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা তা প্রচ্ছন্ন ও গণ্ডিবদ্ধ রাখা বিধেয়। এই সত্যটি যারা উপলব্ধি করেন না বা করতে চান না, তারা পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু সৎ পণ্ডিত নন; রাজনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু সৎ রাজনীতিবিদ নন; সাংবাদিক হতে পারেন, কিন্তু সৎ সাংবাদিক নন।

www.pathagar.com

আমি লক্ষ্য করে ব্যথিত বোধ করছি যে, কোন কোন সাংবাদিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কলমবাজি দ্বারা আমাদের দেশের রাজনৈতিক দিগন্তের দৃশ্য উন্মোচনের বিফল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ব্রিটেনের রাজনীতিতে চেম্বারলেনের ছাতা একটা অত্যন্ত লজ্জাকর প্রতীক। এই ছাতাকে তারা মনে করে Appeasement Policy বা প্রশমনের প্রতীক। কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একবার রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "আমার কলম চেম্বারলেনের ছাতার বাঁট দিয়ে তৈরি নয়।" আপনারা যাঁরা আমাকে রাজনৈতিক মঞ্চের লেখক 'মোসাফির' হিসাবে চেনেন, তাঁরা জানেন, 'মোসাফির'-এর কলমও চেম্বারলেনের ছাতার বাঁট দিয়ে তৈরি নয়। Appeasement Policy কাকে বলে তা আমার জানা ছিল না। যা সত্য ও ন্যায় বলে ভেবেছি, তা দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছি, প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রবল আঘাতে খণ্ডন করতে চেয়েছি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে অনুপস্থিত, জবাব দানে অসমর্থ, সেখানে আঘাত করা লেখকের ধর্ম, সাংবাদিক শালীনতা ও শোভনতার পরিপন্থী মনে করে বিরত থেকেছি। আজ দুঃখ হয় চিরকাল যারা চেম্বারলেনের ছাতার বাঁট দিয়ে তৈরি কলম চর্চা করেছেন এবং এখনো করছেন, দুর্ভেদ্য পেশাগত নিরাপত্তার দুর্গে বসে রাজনৈতিক দৃশ্যের দিগন্তে মাঝেমধ্যে শুধু উঁকিঝুঁকি মেরেছেন, আজ তাঁরা রাজনৈতিক পণ্ডিত সাজার অবকাশ পেয়েছেন এবং এই পাণ্ডিত্য প্রকাশের ছলে বাকরুদ্ধ এবং জবাবদানে অক্ষম গণতান্ত্রিক শিবিরেরই এক বিশেষ পক্ষের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত দেশনেতা ও দেশকর্মীরা ক্ষুব্ধ ও বিচলিত না হলেই আমি আনন্দিত হব। চেম্বারলেনের ছাতা যেমন ব্রিটেনের রাজনীতিতে লজ্জার প্রতীক, আমাদের দেশে যারা চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি কলম চর্চা দ্বারা আজ রাজনৈতিক পণ্ডিত সাজার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কলমও একদিন এদেশের রাজনীতিতে লজ্জার প্রতীক হিসেবে গণ্য হবে বলে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি। হয়ত সেদিন খুব বেশি দূরেও নয়। যারা নিপীড়িত, যারা নির্যাতিত, নিরাপত্তার দুর্গে বসে তাদের বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু তাদের কাতারে সামিল হয়ে দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। আপনারা যদি এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাহলে দেশের মানুষ আপনাদেরই বরণ করে নেবে। আগামী দিনের গোটা ইতিহাস হয়ত সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করছে।

রাজনীতিতে শেষ সত্য বলে কিছু নেই। আছে সত্যোপলব্ধির অব্যাহত চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গল্পে আছে, গৌতম বুদ্ধ একদা বোধিবৃক্ষের নিচে বসে শিষ্যদের সত্যে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্য সহসা প্রশ্ন করল, "তথাগত! আপনি যা বলেছেন, এটাই কি সংসারে শেষ সত্য?" গৌতম বুদ্ধ কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, "এই বৃক্ষ থেকে ক্রমাগত পাতা ঝরছে; তুমি সব ঝরা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে এসো।" শিষ্য নিষ্ক্রান্ত হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ঝুড়ি পাতা নিয়ে ফিরে এলো। গৌতম বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস! সব পাতা নিয়ে এসেছ কি?" শিষ্য বললো, "তথাগত! তা সম্ভব নয়।" পাতা ক্রমাগত ঝরছে, আমি যতটা পেরেছি নিয়ে এসেছি।" গৌতম বুদ্ধ হেসে বললেন, "বৎস! সংসারেও চরম ও শেষ সত্য বলে কিছু নেই। অভিজ্ঞতার মূল্যে সত্যকে ক্রমাগত অর্জন করতে হয়।"

www.pathagar.com

জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রের কথা আমি জানি না, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের এই শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা যারা আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতা, এই প্রতিষ্ঠানের গত বিশ বছরের ইতিহাস জানেন। আপনারা জানেন, এর অভ্যুদয়, উত্থান পতন এবং বন্ধুর পথ পরিক্রমার ইতিহাস।

আজ আমি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে ওকালতি করব না; কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে বলতে হবে, আওয়ামী লীগের শাসন আমলে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার যে সুযোগ উন্মুক্ত করেছিলেন, যেভাবে নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদান এবং শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন বাতিল করে দিয়েছিলেন, তার নজির পাক-ভারত উপমহাদেশে কেন, এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোন দেশেই নেই। আপনারা যদি গণকল্যাণের পথে অটল থাকেন, তবে সত্যের পথেও অবিচল থাকবেন বলেই আমার ধারণা। জনকল্যাণকে বাদ দিয়ে যারা সত্যের প্রতিষ্ঠা চান, তাঁরা নিজেদের যতই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তাত্ত্বিক বলে দাবি করুন, আসলে তাঁরা সত্যের প্রতি বিমুখ।

এই প্রসঙ্গে উন্নয়ন-দশক সম্পর্কে দু'একটা মনের কথা আমি ব্যক্ত করতে চাই। যারা এই দশক জাঁকজমক সহকারে পালন করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই তা করছেন, কিন্তু আমার ধারণা, এর ফল হচ্ছে বিপরীত। প্রথমে সাধারণ উন্নয়নের কথাই ধরা যাক। কোন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাকারীর মতে (এবং প্রকৃতপক্ষেও) দেশের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ যেখানে ২০টি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত, সেখানে এই ভাগ্যবানদের জলুস-উৎসব করার সঙ্গত কারণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু যে উন্নয়ন দেশের শতকরা ৮০/৮৫ জনের দোর গোড়ায় পৌঁছেনি এবং যে উন্নয়নের ঠেলায় এ দেশের কোটি কোটি মানুষ নিঃশেষিত হয়েছে, সেখানে দেশব্যাপী হৈ-হল্লা, নাচ-গান গণমনে বিরক্তির উদ্রেক করে বলেই আমার ধারণা। তা'ছাড়া, একতরফা প্রচারের ফলে জনগণ প্রচার মাধ্যমগুলোর উপরও আজ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। উন্নয়ন প্রচারের পাশাপাশি যদি কর বৃদ্ধির পরিমাণ, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এবং দুর্নীতি প্রসারেরও একটা নকশা তুলে ধরা হতো, তা হলে জনসাধারণ হয়ত উন্নয়ন দশক সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা এবং গঠনমূলক (Constructive) অভিমত গঠন করতে পারতো। এখানে উল্লেখ্য, এই উন্নয়ন দশকে দেশবাসীর উপর করের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা শতকরা দুশো পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দু'হাজার কোটি টাকার উপর।

দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে সত্যটি আজ সবচেয়ে প্রকট, তা' হলো ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। জাতীয় সংহতির প্রধান প্রতিবন্ধক এই বৈষম্য। ১৯৬১ সালে প্লানিং কমিশনের তদানীন্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ সাঈদ হাসান এমন কথাও প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন যে, বৈষম্যের প্রশ্ন আসলে 'মরা ঘোড়ায়' পরিণত হয়েছে। চতুর্দিক থেকে তার তুমুল প্রতিবাদ উত্থিত হলে অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা তখন বলতে শুরু করলেন যে, ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। এখানে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে তিক্ততা বাড়াতে চাই না, তবে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের তথ্য মতে দেখা যাচ্ছে, দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলছে— কমছে না।

www.pathagar.com

আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও আমার শারীরিক অবস্থা তার অন্তরায়। আর মাত্র দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব এবং এই দুটি প্রসঙ্গই মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বেসর্বা প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে নিবেদিত।

বর্তমান শাসনব্যবস্থা ভালো কি মন্দ, তা জনসাধারণ দ্বারা পরীক্ষিত হয়নি। যাকে রাজনৈতিক আমল বলা হয়, সে আমলে যে আমরা খুব সুখ-শান্তি ও নিরাপদে ছিলাম তাও নয়। আমাদের ভাগ্যে তখনো নির্যাতন জুটেছে, তবে বিলম্বে হলেও তার প্রতিকারের একটা পথ ছিলো। আজ যারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা তথা জনাব নূরুল আমিনের আমলের ধর-পাকড় ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে নিজেদের দোষ ঢাকা দিতে চান, তারা ভুলে যান যে, সে আমলে জনগণের ভোটাধিকার ছিলো বলে অনাচারের হোতাদের সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিলো। এইতো গণতন্ত্রের মহিমা! কিন্তু বর্তমান স্থিতিশীলতার জামানায় অন্যায়, অবিচার এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে আত্মঅধিকার-বলে কোন প্রতিকার পাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষত যে পদ্ধতিতে আমাদের প্রতিনিধি মনোনীত করা হচ্ছে, তাতে অবস্থা আরো শোচনীয় এবং মানুষ আরো অসহায় হয়ে পড়েছে।

এখানে দু'একটা উদাহরণ দেয়া হলে অবস্থার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাবে বলে আমার ধারণা। সামরিক শাসন কায়েমের কয়েক দিনের মধ্যে প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী মিঃ জাকির হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন। তিনি যেদিন অপরাহ্নে শপথগ্রহণ করলেন, সেই দিনই দুর্নীতি দমন আইন সংশোধন করে মধ্যরাতে শেখ মুজিবসহ কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও পদস্থ সরকারি কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি অভিযোগে নয়টি মামলা রুজু করা হয়। তাঁর উপর নিরাপত্তা আইনের ব্যাপক প্রয়োগও করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ঐসব মামলায় জামিন দেয়া হলেও নিরাপত্তা আইনে আটক থাকায় তাঁর মুক্তির জন্য তদবির করাও সম্ভব ছিলো না। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন কমাণ্ডার ইন-চীফ জেনারেল মুসা যখন ঢাকা সফরে আগমন করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই অবিচারের কাহিনী বর্ণনা করি এবং দাবি করি যে, নিরাপত্তা আইনের অভিযোগ থেকে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলোর আইনসঙ্গত তদবির করার সুযোগ দেয়া হোক। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কার উদ্যোগ বা প্রভাবে জানি না, শেখ মুজিব ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে নিরাপত্তা আইনের অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভ করেন। আপনারা জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত নয়টি মামলার মধ্যে আটটি মামলায়ই নিম্ন আদালতে বেকসুর খালাস পান। কেবলমাত্র স্পেশাল জজ মিঃ মওদুদের আদালতে তাঁকে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে তিনি তাতেও বেকসুর মুক্তি লাভ করেন। আমার মতন নগণ্য বান্দাকে নিয়েও টানা-হ্যাঁচড়া করতে তাঁরা কম করেননি। ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর হঠাৎ মধ্যরাতে সামরিক আইনের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদী ধারা বলে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে চোর-ডাকাতদের সাথে খিড়কি জানালাহীন 'সেলের' মেঝেতে আমাকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়। যেখানে দু'গজের

www.pathagar.com

ব্যবধানে শোওয়া-খাওয়া পেশাব পায়খানার ব্যবস্থা। এই চরম বিপদের মধ্যে সান্ত্বনা ছিলো, প্রাদেশিক প্রশাসনিক অফিসারদের কেউ কেউ সেদিন কিছুটা বুকের পাটা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, আমি সামরিক আইন লঙ্ঘন করিনি। আমি যতটুকু জানি, তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী মিঃ আজফার করাচিতে প্রেসিডেন্টের কাছে এই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই আমাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো। শুধু কি তাই?

আমার পত্রিকা 'ইত্তেফাক' নিয়েও আমাকে কম হয়রানি করা হয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন কোন রকম পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, আওয়ামী লীগের পার্টি ফাণ্ডের অথবা কোন বৈদেশিক সূত্রের অর্থে নয়, শতকরা সর্বোচ্চ ৯ টাকা হারের সুদে মেশিনপত্র বন্ধক দিয়ে নারায়ণগঞ্জ টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ইত্তেফাকের যে প্রেস করা হয়, তাকেও অপরাধের মধ্যে গণ্য করে ব্যাংকের ঋণের সমুদয় টাকা এককালীন পরিশোধ করার জন্য আমার উপর সার্টিফিকেট জারি করা হয়।

এই রকম বহু নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করা যায়। কিন্তু তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ কি? সব কিছু দেখে শুনে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, যাদের ধরে নিয়ে রাতারাতি আমাদের প্রতিনিধি সাজিয়ে বড় বড় পদে বসানো হয় তাদের অনেকেরই ধারণা, এই অঞ্চলের লোকদের-বিশেষ করে মুখর রাজনীতিকদের যে কোন প্রকারে দাবিয়ে রাখতে পারলেই অথবা কেউ মাথা তুললে তার মাথা ভেঙ্গে দিতে পারলেই কর্তাব্যক্তিরা তার প্রতি তুষ্ট থাকবেন এবং তার চাকরিও পাকা-পোক্ত হবে। কর্তাব্যক্তিরা এই ধরনের আচরণে খুশী হন কিনা জানি না, জনাব জাকির হোসেনের চাকরি যে পার্মানেন্ট হয়নি তা এ দেশের মানুষের অজানা নেই। তবে ক্ষমতা হাতে পেয়ে যে অনাচার ও অত্যাচার করেছেন, তার জন্য তিনি আজ দেশবাসীর কাছে ডাস্টবিনের আবর্জনাপেক্ষাও উপেক্ষণীয়।

আমি হালকাভাবে বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশত এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করিনি। এটাই আজ পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু ও মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি পূর্ব পাকিস্তানে কোন চরমপন্থীর উদ্ভব হয়ে থাকে, তাও মূলত এই কারণে। আমার ভগ্নস্বাস্থ্য যখন জীবন সংশয় সৃষ্টি করেছে, সেই মুহূর্তে আমি কারো স্বার্থে কিংবা কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলবো না। আমার মন আজ যা ডাক দিয়ে বলছে, তা-ই আমি প্রকাশ করছি। গত দশ বছর 'জাকির সম্প্রদায়ের লোকেরা' পূর্ব পাকিস্তানের মনোনীত 'প্রতিনিধিরা' মানুষের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য অপেক্ষাও আমি তাকেই অধিকতর মারাত্মক মনে করি। এই প্রশ্নটা উপেক্ষা করে 'সংহতি' 'সংহতি' বলে গলা ফাটিয়ে যতই চীৎকার করা হোক না কেন, তা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। গণতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ প্রেসিডেন্টকেই নিতে হবে। প্রেসিডেন্টের চতুষ্পার্শ্বে এই পথের প্রতিবন্ধক হিসেবে যাঁরা বিরাজ করছেন, তাঁরা যেহেতু জনগণ বর্জিত, সেইহেতু তাদের অনেকেই দেশ তথা জাতীয় সংহতি অপেক্ষা স্বীয় গদি সংরক্ষণেই অধিক উদগ্রীব।

www.pathagar.com

আবার এদিকে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'র নামে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকাতে হঠাৎ কেন এই ইস্যুর অবতারণা করলেন, তা আমার মনে বিস্ময়েরই উদ্রেক করেছে।

প্রেসিডেন্টের বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের 'তরক্কী-এ-উর্দু' উর্দু'কে পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে ও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছিলো। যা'হোক, খাজা শাহাবুদ্দিন প্রমুখের এই সম্পর্কিত বিবৃতি সেই উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত করেছে বলে আমার ধারণা। ঢাকাতে প্রেসিডেন্ট কেন এই বিবৃতি দিলেন, তা নিয়ে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। নজরুল একাডেমীতে এমন এক-আধজন লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার জন্য চাটুকারিতার মতলবে প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে থাকতে পারেন যে, নজরুলের কবিতায় বহু আরবি-ফার্সী শব্দ রয়েছে; সুতরাং আরবি হরফে বাংলা লেখা কিংবা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার' নামে দেশে একটিমাত্র জাতীয় ভাষা প্রচলন করা যেতে পারে। আমার মনে সন্দেহ জেগেছে এই কারণে যে, এই বাংলাদেশে এহেন সুযোগ-সন্ধানী 'ব্ল্যাকশিপের' অভাব নেই। মালিক ফিরোজ খান নূন যখন এই প্রদেশের গভর্নর ছিলেন, তখন জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) গভর্নরের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, বাঙালি মুসলমান ছেলে-পিলেদের খাৎনা করা হয় না এবং মুসলমানদের ঘরে ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণের পর তাদের নামকরণের জন্য হিন্দু বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরোজ খান নূন এই স্বার্থান্বেষী কর্মচারীটির কথায় আস্থা স্থাপন করেন এবং এক জনসভায় এই উক্তি করতে গিয়ে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসেন। ফলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের তুমুল ঝড় ওঠে। তাঁর মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকেন। ফিরোজ খান নূন আহম্মক বনে গেলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে তেমনি কোন স্বার্থসর্বস্ব মহল কর্তৃক প্ররোচিত হয়েছেন কিনা, সে সন্দেহ আজ মনে জাগে।

প্রেসিডেন্ট সমীপে আমার শেষ কথা ঃ যারা ডাণ্ডা মেরে সব ঠাণ্ডা করে রাখার নোসখা বাৎলাচ্ছেন, সেই 'জাকিরিয়া' সম্প্রদায়ের লোকদের সর্বপ্রযত্নে প্রত্যাখ্যান করুন।

এদেশের মানুষের নাড়ির খবর আমি রাখি, আর রাখি বলেই এই প্রদেশের যারা গণসমর্থনের লম্বা লম্বা বুলি আওড়ান, তাঁদের প্রতি ইত্তেফাককে অবলম্বন করে নয়, ইত্তেফাক ছাড়াই এই চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতাও আমি রাখি যে, সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তাঁদের একজনও সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের শতকরা ১০টি ভোট লাভ করতে সক্ষম হবে না।

এই কারণেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের উদ্দেশে আমার বক্তব্য, এই সব 'জনপ্রিয়' নেতাদের কথায় কান না দিয়ে তিনি দেশের এগারো কোটি মানুষের মনের কথায়ই কান দিন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দেশের দুই অংশের মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্র্যের মনোভাব ছিলো, তা ফিরিয়ে আনতে তিনি যত্নবান হোন। কেবল সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

গণ্ডির মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে তিনি স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন। তাঁর প্রচারবাগীশরা যে যত কথাই বলুন না কেন, একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পরস্পর থেকে আজ আমরা দূরে এবং বহুদূরে সরে গেছি। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেদিনকার সেই নিবিড় বন্ধন শিথিল হয়ে দেশে আজ এমনই এক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যেখানে আমাদের একের রক্তই যেন অপরের কাম্য হতে চলেছে। দেশ ও জাতির জন্য এই পরিস্থিতি কখনোই কল্যাণকর নয়।

কথা হলো, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? দায়ী এদেশের স্বার্থসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোক; সৎচিন্তা ও শুভ কামনার কোন আবেদন যাদের বিবেকের কাছে বা ধমনীতে নেই। দেশ ও জাতির সংহতির স্বার্থে এদেরকে আর প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন নয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, খোদা না করুন, দেশের এই অবস্থা চলতে থাকলে জাতীয় সংহতি বা জাতীয় অস্তিত্ব যদি কখনো বিপন্ন হয়, তবে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তার সব দায়িত্বই প্রেসিডেন্টের একক স্কন্ধে গিয়েই বর্তাবে। সেদিন আজকের এই স্তাবক ও চাটুকারের দল পিঠটান দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করবে না। এরা ইতিমধ্যে দেশ এবং জাতির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে। তারা নিজেদের ক্লাউনে পরিণত করেছে, তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মান বেড়েছে বললে ভুল হবে। তাই তাদেরকে আর প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন হবে না।

কথায় কথায় 'কনফ্রন্টেশন'-এর এ পরিবেশ দেশ ও জাতির স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল নয়। এই মানসিকতাকে বর্জন করে দেশের আপামর মানুষের কল্যাণ চিন্তায়, তাদের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে, তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিজকে সরিয়ে না রেখে তাদের সঙ্গে নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু সহায়ক হতে পারে তারই পথ প্রশস্ত করতে প্রেসিডেন্ট যত্নবান হোন, আমি তা-ই কামনা করি।

সবশেষে আপনাদের তথা এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের উদ্দেশেও আমার দু'একটা কথা বলার আছে। ব্যষ্টিকে নিয়ে, সমষ্টি নিয়েই জাতি। তাই, জাতির স্বার্থই যখন আমাদের সত্যিকার কাম্য, তখন কিসে জাতির কল্যাণ নিহিত, সেই চিন্তাতেই সকলকে আজ মনোনিবেশ করতে হবে। কেবল অন্ধবিদ্বেষ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন নিয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত না থেকে এদেশের এগারো কোটি মানুষের মুখে সত্যিকার হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলে নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের অবসান ঘটান, দেশবাসীকে সঠিক নেতৃত্ব দিন।

দেশের সর্বসমাজের প্রতি বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করার আবেদন জানিয়ে আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ কামনায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের আজকের এই অধিবেশনের আমি উদ্বোধন ঘোষণা করছি। যাত্রা আপনাদের শুভ হোক।

১৯৬৮ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।

www.pathagar.com

সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব

তরুণের সভায় যখন আমাদের মতন প্রবীণদের ডাক পড়ে, আমরা তখন অসীম আনন্দ লাভ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার কিছুটা শঙ্কিতও যে না হই, তাও নয়। আনন্দিত হই তরুণদের সঙ্গে মিশে, তরুণদের স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের অংশীদার হতে পারব বলে; তাদের সংগ্রাম ও সাধনায় আশান্বিত ও অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ পাব বলে। আর শঙ্কিত হই কিছু বক্তব্য রাখতে হবে আশঙ্কায়। সচরাচর কিছু বলার জন্যই তরুণের সভায় ডাক পড়ে আমাদের আজও। সেই তাগিদেই এই সমাবেশে আমার উপস্থিতি।

যে বিষয়ে বলার জন্য আমি অনুরুদ্ধ, অনিবার্য কারণবশতই সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একজন সংবাদপত্রসেবী হিসেবে ঘটমান বর্তমানই আমার মনোযোগের বিষয় ঃ ঘটমান বর্তমান সংবাদপত্রসেবীর মনোযোগ এতই ব্যাপৃত রাখে যে, ইচ্ছা থাকলেও অতীতের দিকে তেমন করে ফিরে তাকাবার অবকাশ তার মেলে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ততটা মনোনিবেশের সুযোগ তার নেই। অথচ, 'সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব' এমনই একটি তাত্ত্বিক বিষয়, যা দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির যুগ পারস্পরিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুধাবনযোগ্য। তা না হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কাজেই দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি-এই তিন বিষয়ে যথার্থ সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই আলোচিতব্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে যতটা সুবিচার করতে পারতেন, স্বভাবতই আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। তবু এই পৃথিবীতে আমিও বাঁচি, জনতার সঙ্গে আমিও আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগে আন্দোলিত হই, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে আমিও চিন্তা-ভাবনা করি এবং তার কার্য-কারণ ফলাফলের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য আমিও কখনো কখনো অনুসন্ধিৎসু হই। আমি যে এই পৃথিবীর এই শতাব্দীর একজন মানুষ, এই পৃথিবীর আলোবাতাসের উপর আমারও যে অধিকার আছে এবং মানব সমাজের ভালো-মন্দের সাথে আমিও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সুবাদেই এই জটিল বিষয় সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য পেশ করব।

"সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব" বলতে আমরা কী বুঝি, প্রথমে সে সম্পর্কেই কিছু বলা দরকার। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিভাষায় 'সার্বভৌম' শব্দটির উদ্ভব লাতিন শব্দ 'সুপারেনাস (Superanus) থেকে; এর অর্থ 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা' বা চূড়ান্ত ক্ষমতা।

প্রশ্ন হলো, এই বিশ্ব চরাচরে চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক বা অধিকারী কে? শতাব্দী ধরে এই প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ চলেছে। সাময়িকভাবে হয়ত এর একটা মীমাংসাও হয়েছে। কিন্তু কিছুকাল পরে আবার তা নিয়ে নতুন বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে। 'সার্বভৌমত্ব' এর

www.pathagar.com

অধিকার সম্পর্কিত এই যুগ পরম্পরায় বিতর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি আমি যথাস্থানে আলোচনা করব। আপাতত এই সর্বজনস্বীকৃত প্রতিপাদ্য দিয়েই আরম্ভ করি যে, আধুনিক কালে আমরা জানি যে 'চূড়ান্ত ক্ষমতা' বা সার্বভৌমত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ নয়, এর মালিক জনসাধারণ । সমকালীন দুনিয়ার স্পষ্ট রায়,– চূড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই থাকবে।

জনসাধারণের 'চূড়ান্ত ক্ষমতা' বা 'সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব'-এর ধারণা কোন অস্পষ্ট ব্যাপার নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণাপত্র এবং বিংশ শতাব্দীর জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সনদে' 'সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব'-এর ধারণাটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। ফরাসি বিপ্লবের সাত দফা ঘোষণার প্রধান তিন দফা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেগুলো হচ্ছে ঃ

প্রথম দফা ঃ মানুষ যেমন সকলে সমানভাবে মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তেমনি অধিকার ভোগের দিক থেকেও তারা সবাই সমান। সুতরাং মানুষের সামাজিক পার্থক্য কেবল সামাজিক প্রয়োজনেই স্বীকার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দফা ঃ মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখাই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে সব অধিকার হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার, সর্বপ্রকার শোষণ ও উৎপীড়নে বাধা দান এবং তার কবল থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

তৃতীয় দফা ঃ সকল প্রকার সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে সমগ্র জাতি। যে ব্যক্তি বা দল জাতির নিকট থেকে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে নাই, সেই ব্যক্তি বা দল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়।

ফরাসি বিপ্লবের প্রায় পৌনে দুশো বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ। যুদ্ধ প্রতিরোধ, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণই এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের বিঘোষিত উদ্দেশ্য। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার সনদ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। তাতে কতকগুলো বিশেষ অধিকারকে চিহ্নিত করা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত ও অলঙ্ঘনীয় অধিকাররূপে জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত মানুষের জন্মগত অধিকারসমূহ মোটামুটি এরূপ ঃ

"জনসাধারণের ইচ্ছাই হবে প্রত্যেক দেশের সরকারের শাসন-ক্ষমতার ভিত্তি; এবং জনসাধারণের এই ইচ্ছা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক সত্যিকার নির্বাচন মারফত ব্যক্ত করার অবাধ সুযোগ দিতেই হবে; প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থান করতে হবে; বেকার অবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যেককে নিরাপত্তা দিতে হবে; প্রত্যেকের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকবে; প্রত্যেকেরই নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা ও উত্তমরূপে পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে উপযুক্ত জীবিকার মান (আয় এবং বেতন) লাভের অধিকার আছে; প্রত্যেকের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ থাকতে হবে; কাউকে কারণ না দেখিয়ে গ্রেফতার করা চলবে না; কারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা এবং কারো ঘরের শান্তি নষ্ট করা চলবে না; স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশের অধিকার সবার থাকবে; সবারই থাকবে তথ্য অবগত হওয়ার অধিকার।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের সময় যে মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তা ছিল ইতিহাসের সর্বপ্রথম সামাজিক মানুষের মৌলিক অধিকারের ভিত্তি। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ তারই প্রসারিত ও প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব-এর প্রতিরূপ। বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন মানব সমাজের অগ্রসরতা বা সভ্যতা এই সনদের নিরিখেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই জন্মগত মৌলিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারের সনদ অর্জিত হয়েছে বহু শতাব্দীর অবিরাম সংগ্রাম মারফত। সেই সংগ্রাম ইতিহাসের কোন স্তরেই সরল রেখায় অগ্রসর হয়নি। একদিকে চলেছে চিন্তার জগতে নিরন্তর সংঘাত আর অন্যদিকে চলেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একের সঙ্গে অন্যের তীব্র সংঘর্ষ। ফলত মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ধারা নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসেছে।

চিন্তা ও ধারণার জগতে এই সংঘাতের স্বরূপ আমরা প্রথমে অনুধাবন করতে চেষ্টা করব। কেননা, আমরা জানি, পৃথিবী কখনো শক্তি ও বলের দ্বারা শাসিত হয়নি; শাসিত হয়েছে চিন্তা-ভাবনার দ্বারা।

সক্রেটিস যদিও ইউরোপের দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবিসংবাদিত গুরু, তবু তাঁর শিষ্য প্লেটোর মতামতই প্রভাব বিস্তার করেছে সবচেয়ে বেশি। ব্যাপকভাবে 'প্লেটোর প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের 'আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা' ইউরোপীয় ভাবানুশীলনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বহুকাল প্লেটোর এই আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুটো স্পষ্ট সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই দুই শ্রেণীর একটি হচ্ছে অভিজাত সম্প্রদায় এবং অপরটি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্লেটোর মতে অভিজাত সম্প্রদায় স্বর্ণতুল্য অথচ সাধারণ মানুষকে তিনি লোহার চেয়ে বেশি মনে করতেন না। সমাজবদ্ধ মানুষকে তিনি এমনিভাবে 'সোনা' আর 'লোহা' নামক দুই শ্রেণীতে ভাগ করেই ক্ষান্ত হননি। তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, একের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে অপরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কখনো মিল হতে পারে না, মিলন ঘটতে পারে না, আপস হতে পারে না। সামাজিক শ্রেণীর পক্ষে নির্ধারিত সীমানায় থেকে কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রস্বরূপ পরম সত্তার সেবা করে যাওয়াই পার্থিব জীবনের একমাত্র কাজ। কেননা, প্লেটো বিশ্বাস করতেন, 'নগর' সব সময়ই নাগরিকের চেয়ে বড়; নগরের জন্যই 'নাগরিকের' সৃষ্টি, নাগরিকের জন্য 'নগরের' সৃষ্টি নয়।

মানুষ একে অপরের সমান নয়, সুতরাং অসাম্যই হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তি। এই ছিল প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাংবিধানিক মূলতত্ত্ব। কাজেই সাধারণ মানুষকে জীবিকা অর্জন করতে হবে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা। সে দিন-রাত খাটবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে; তবেই তার বাঁচবার উপায় হবে। এটাই তার কর্তব্য। রাজনীতি চর্চা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সুতরাং, রাষ্ট্র পরিচালনার কোন ব্যাপারে তাদের নাক গলানো অনৈতিক, অবাঞ্ছিত ও গর্হিত। রাজনীতি চর্চার একমাত্র অধিকার 'স্বর্ণ' সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর। এই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও চাহিদার বেদীমূলে ব্যক্তি জীবনের সর্বস্ব অকাতরে নিবেদন করার নামই নীতি বা মর‍্যালিটি, কেননা 'মর‍্যালিটি' প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাস্থ্যবিধি ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

প্লেটো বর্ণিত রাজনৈতিক স্বাস্থ্যবিধি আধুনিককালে যতই অশ্রদ্ধেয় ও বিরক্তিব্যঞ্জক বিবেচিত হোক, ইউরোপের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-চিন্তা বহুকাল যাবৎ এর দ্বারা ব্যাপক ও গভীরভাবে আন্দোলিত ও প্রভাবিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য মনীষার তত্ত্বানুশীলন বারে বারে এই প্লেটোনিক বিধির চারপাশে ঘিরে বিচিত্রভাবে আবর্তিত হয়েছে। আধুনিককালেও সে আবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ যে আমরা না দেখি, তা নয়।

হেগেলের মতন একজন অসামান্য প্রতিভাধর দার্শনিক পর্যন্ত এই প্লেটোনিক তত্ত্ব দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হেগেলীয় দার্শনিক মতবাদের পরস্পর বিরোধিতায়। তাঁর মতবাদে একদিকে দেখি বস্তুবাদের প্রকাশ আর অন্যদিকে দেখি ভাববাদের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। পরিণামে, তাঁর বস্তুবাদী মতবাদও ভাববাদী চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হেগেল প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ থেকে বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে শাশ্বতভাবের (Eternal Idea) ধারণা গ্রহণ করে তার সাথে মানুষের চিন্তা ও কাজের গতিশীল ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেন এবং তার নাম দেন পরম ভাব (Absotule Idea)। হেগেলের এই পরস্পরবিরোধী দার্শনিক মতবাদের প্রথম অংশ অর্থাৎ পরিবর্তন ও গতিশীলতা সম্বন্ধীয় অংশকে বলা হয় 'ভাববাদ'। হেগেলের মতে ভাব 'দ্বন্দ্ব' প্রগতির মারফত চরম বিকাশ লাভ করে 'পরম ভাব'-এ (Absotule Idea) পরিণত হয় এবং তার মতে সেই 'পরম ভাব' এবং বিধাতা অভিন্ন।

হেগেলের মৃত্যুর পর তার পরস্পরবিরোধী মতবাদের ভিত্তিতে তাঁর শিষ্যবর্গ দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল হেগেলীয় মতবাদের মানবীয় দিকটা সম্পূর্ণ বর্জন করে অতি মানবিক দিক গ্রহণ করেন এবং হেগেল নিজে যা ভাবেননি, তাঁরা তা থেকেও অনেক দূর এগিয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে দার্শনিক নীৎসের নাম বিশেষভাবে স্মরণ না করে উপায় নেই। সবচেয়ে কঠোর তত্ত্ব উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তাঁরই। মানব জাতিকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেন ঃ এক, সুপারম্যান (Superman) বা অতিমানব; দুই, স্লেভ (Slave) বা দাস। 'সুপারম্যান' শাসন করবে আর 'স্লেভ' সেই শাসন নত মস্তকে মেনে নেবে-এই হচ্ছে বিশ্ব বিধাতার বিধান। নীৎসেপন্থী ফিকটের (Fichte) সুর আরো উঁচু গ্রামে। ফিকটের জার্মান জাতির প্রতি অভিভাষণে বলা হয়, পৃথকভাবে ব্যক্তির কোন সত্যিকার অস্তিত্ব নেই; রাষ্ট্রের প্রয়োজনের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করাই হচ্ছে ব্যক্তির একমাত্র অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। অনেকেরই জানা আছে, নীৎসে ও ফিকটের এই দুর্ধর্ষ দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ইউরোপে নাজীবাদ ও ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। জানা যায়, ১৯৩০ সালের পর জার্মানিতে নাকি সরকার ঘোষিত অন্যূন একশো আঠাত্তর জন দার্শনিক অব্যাহতভাবে নীৎসে ও ফিকটের এই মতবাদ প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হিটলার, মুসোলিনী ও তাঁদের সহচরেরা সেই ভাব পরিমণ্ডলেরই মানস-সন্তান।

পূর্বেই বলেছি, এই চিন্তাধারার সম্পূর্ণ অবসান আজো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজীবাদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটলেও যে চিন্তাধারা থেকে নাজীবাদ ও ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি,

www.pathagar.com

তার অস্তিত্ব আজো লোপ পায়নি। ঠিক সেভাবে বা ততটা স্পষ্টরূপে না হলেও সাম্প্রতিক ইতিহাসের রাজনৈতিক তাণ্ডবে সে মতবাদের প্রকাশ আমরা অবশ্যই দেখতে পাই। সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক তাণ্ডবের 'শক্ত মানবেরা' স্পষ্টত না হলেও সে ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। জনসাধারণের কথা তাদের মুখে থাকলেও মনে নেই। মনে আছে সেই 'সুপারম্যান' আর 'স্লেভ' তত্ত্বেরই বিকার।

লক্ষণীয় যে, ঐশী অবদান স্বরূপ রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তিসত্তার আত্মসমপর্ণই হচ্ছে এ-সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী। স্বভাবতই এই ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড়। আমরা জানি, সব সম্রাটই রাজত্ব করেছেন কিংবা করতে চেয়েছেন ধর্মের নামে। পৃথিবীতে তাঁরা স্বয়ং বিধাতার প্রতিভূ। শাসন করার জন্যই তাঁরা ধরাধামে প্রেরিত; তাঁদের সেই অধিকার বিধিদত্ত, এই তাঁরা বলেছেন। সামন্ত শ্রেণী এবং স্বেচ্ছাচারী একনায়কগণও একই প্রকার দাবি করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলেও একথা একান্ত সত্য যে, তাঁদের এ কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছেন তাঁরাই, যাঁদের আমরা জানি ধর্মের হেফাজতকারী হিসেবে। কখনো কখনো কোন সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ যাজক শ্রেণী সাধারণত রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন। সব সময়েই তাঁরা বুঝে শুনে এ কাজ করেছেন, তেমন নাও হতে পারে। হয়ত অনেক সময় রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা তাঁরা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু, কারণ যাই হোক, ঘটনাটা বরাবর তাই ঘটেছে। এমনকি আমাদের মুসলিম জগতের ইতিহাসও মোটেই আলাদা কিছু নয়। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রয়োজনেই– মুসলিম জাহানে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং ইসলামের ইতিহাসে বাদশাহী আমলের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে এই পুরোহিত শ্রেণী রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রকেই সমর্থন করে আসছেন।

এই ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি বস্তুবাদী দর্শনও অবশ্য ছিল। ইউরোপে প্রথমে গ্রীক দার্শনিকেরাই ভাবের উপর বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। ইউরোপীয় দর্শনের জনকরূপে পরিচিত গ্রীক দার্শনিক থেলিস (Thales)-এর মতে পানি, এনাক্সিমেন্ডার (Anaximander) -এর মতে বাতাস এবং হিরাক্লিতাস-এর মতে আগুন থেকেই এই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে এর সঙ্গতি সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ-এই চারটি মূল উপাদান থেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির সৃষ্টি। এই চিন্তাধারা যতই আদিম স্তরের হোক তাতে এই ধারণা দেবারই চেষ্টা করা হয়েছিল যে, সকল পদার্থই এক অনন্ত পরিবর্তন ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। গৌতম বুদ্ধের পুনর্জন্মবাদে আসলে উপাদানের রূপান্তরের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তথাপি বস্তুবাদী বা জাগতিক বা মানবিক দর্শনতত্ত্ব রাষ্ট্রীয় জীবনে কখনো প্রবল হয়ে উঠেনি বা উঠতে পারেনি, তার কারণ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল রাজশক্তি ও স্বৈরশক্তির তীব্র বিরোধিতা।

www.pathagar.com

ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল প্রতিবাদ শোনা যায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক জন লক (John Locke) -এর কণ্ঠে। তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের দ্বারা রাজতন্ত্রের ঐশী অধিকারের দাবি খণ্ডন করেন এবং সকল রাজনৈতিক সমস্যা যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করেন। 'অন সিভিল গভর্নমেন্ট' (On Civil Government) নামক তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধে তিনি বলেছেন, আদম পৃথিবীর প্রথম মানুষ কিন্তু পিতৃত্বের অধিকার তেমন কোন স্বাভাবিক নিয়ম ছিল না কিংবা ঐশী শক্তির নিকট থেকে এমন কোন দান-পত্রও তিনি লাভ করেননি, যাতে করে তাঁর বংশধরদের কিংবা পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অধিকার ছিল বলে মেনে নেয়া যায়। আদমও এমন ধরনের অধিকারে অধিকারী ছিলেন বলে যেসব কথা আমরা শুনেছি, তার সবটাই বানানো। তৎসত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া যায় যে, তাঁর সেই অধিকার ছিল, তবু তাঁর বংশধরদের কারো সেরকম অধিকার ছিল বলে আমরা মানতে পারি না।

জন লক আরো ঘোষণা করেন, কারো হাতেই বিধাতার সনদ নেই। অতএব "ধরাপৃষ্ঠে সব মানুষই স্বাধীন এবং সব মানুষই সমান, সামাজিক মানুষের স্বাধীনতা কেবল সেই রকম আইন পরিষদেরই অধীন হতে পারে, যে পরিষদ সবার অনুমতিক্রমে গঠিত এবং কেবল সেই রকম আইন দ্বারাই বিচার হতে পারে, যে আইন সকলের সম্মতিক্রমে রচিত।" বলা নিষ্প্রয়োজন, জন লকের এই মতবাদ তদানীন্তন ইউরোপে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। রাজশক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং লককে দেশ থেকে দেশান্তরে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু তাঁকে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হলেও তাঁর মতবাদকে নির্বাসিত করা সম্ভব হয়নি। এই মতবাদ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। লকের মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেন কয়েকজন মানবতাবাদী দার্শনিক। অগণিত মানুষের উপর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা ঘোষণা করেন বিরামহীন সংগ্রাম। মানুষের জীবন সুখী ও শান্তিপূর্ণ করে তোলাই ছিল এই দার্শনিকদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা মানুষকে ভাববাদের গজদন্তের মিনার থেকে মাটির ধরায় নেমে আসতে পরামর্শ দেন। তাঁরা দেখান যে, মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং, মানুষের উন্নততর জীবনের জন্য উন্নততর সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অবস্থা অপরিহার্য। এদেরই সবচেয়ে সরব ও বলিষ্ঠ দু'জন মুখপাত্র হচ্ছেন রুশো ও ভলতেয়ার। তাঁদের দার্শনিক ভাবধারাই ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার' অমর বাণীতে স্পষ্ট সহজ রূপ লাভ করে। 'সাম্য' দিয়ে বোঝানো হয়েছিল শ্রেণী বিভেদবর্জিত সর্বজনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আর 'স্বাধীনতা' দিয়ে বোঝানো হয়েছিল সকল প্রকার শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে সকল মানুষের মুক্তি। ফরাসি বিপ্লবের সময়ই গঠিত হয় 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' বা গণ-পরিষদ। সেই গণ-পরিষদের অধিবেশনেই গৃহীত হয় ইতিহাসখ্যাত মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র।

ফরাসি বিপ্লবের সেই 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার' আদর্শ কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ পৌনে দুশো বছরে আমরা

www.pathagar.com

দেখি, সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার এবং দু দুটো মহাযুদ্ধ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও মানুষের অগ্রগতি প্রতিহত হয়নি। বিজ্ঞানের নিত্য-নব আবিষ্কারে মানুষের বহু যুগের কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে, জ্ঞানার্জনের পথ হয়েছে প্রশস্ত এবং এক দেশের মানুষ এসেছে অপর দেশের মানুষের কাছাকাছি। এই সময় একদিকে দেখি ভাববাদী দর্শনের অধোগতি আর অন্যদিকে দেখি বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ। অধোগতি চূড়ান্ত বিকারের পরিণতিরূপে একদিকে দেখি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং বিকাশের ফলশ্রুতির বাস্তব উদাহরণরূপে দেখি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এবং এই দ্বন্দ্বেরই এক ক্রান্তিলগ্নে আমরা লাভ করি জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত মানবাধিকার।

এই হচ্ছে 'সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব' সম্পর্কিত পশ্চাদভূমি। সম্পূর্ণ ভূমিতে কি আছে, তৎসম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। তবে ইতিহাসের অগ্রগতির ধারায় পৃথিবীর গতি কোন দিকে তা অনুমান করার প্রয়াস আমরা অবশ্যই নিতে পারি।

ইতিহাসের প্রথম কথাই হলো পরিবর্তন। আমরা জানি, মানুষের জীবনযাত্রা বা সমাজের অগ্রগতি চিরকাল একভাবে চলে না। সামাজিক কোন বিধি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে বটে, তবে তারও একটা আরম্ভ ছিল এবং শেষ থাকবে। কোন প্রথা বা ব্যবস্থাই তাই অনাদি অথবা অনন্ত হতে পারে না। মানুষের ইতিহাস নিত্যবহমান স্রোতস্বতীর মত; সেখানে সনাতন বা চিরস্থির কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারণারই নাম দিয়েছেন বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। এই ক্রমবিকাশ শুধু প্রাণিজগতেরই নিয়ম নয়, জড়জগতেও এই নিয়মের ক্রিয়াশীলতা আমরা দেখতে পাই।

পরিবর্তন সর্বদা সমান বেগে চলে না; প্রকৃতির নিয়মেই পরিবর্তনের তাল অসমান। মানুষের বিধি-ব্যবস্থা বা ধারণার জগতে কখনো পরিবর্তন আসে প্রচণ্ড বেগে আবার কখনো আসে ধীর মন্থর গতিতে। এই অসমান গতির জন্যই ক্রমবিকাশের ধারা সব সময় ঠিক সমানভাবে অগ্রসর হয় না। আমরা জানি, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

ক্রমবিকাশের পথে কোন দেশ বা জাতি এক সময় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে যে এগিয়ে গেল সে যে চিরকালই এগিয়ে থাকবে অথবা যে পিছনে পড়ল সে যে বরাবরই সে অনুপাতে পিছনে পড়ে থাকবে, এমন কোন কথা নেই। ইতিহাসে বার বার দেখা যায় অগ্রবর্তীরা পিছিয়ে পড়ছে আর পিছিয়ে পড়ারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উৎপাদন প্রথা ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজ গড়ে ওঠে; সামাজিক জীবন ও সত্যতার রূপ বদলে যায়। এই ভাবেই এক যুগ থেকে অন্য যুগে, সভ্যতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে মানবজাতির উত্তরণ ঘটে। তাই ইতিহাসের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো গতি। এই গতি আবার একটা বিশেষ লক্ষণমণ্ডিত, ভূগোলের এক এক অংশে অসংখ্য নদীপথ চোখে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব স্রোতের গতি একই দিকে। বিশ্ব সংসারে ও মানুষের রাজ্যে সে রকম নানা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, কিন্তু পরিবর্তন প্রবাহের মধ্যে তাদের অগ্রগতি একটিমাত্র সাধারণ লক্ষ্যের

www.pathagar.com

নির্দেশক। কবির ভাষায় তার মর্মবাণী হচ্ছে; "শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।"

কবির এই বাণীর রাজনৈতিক পরিভাষার নামই হচ্ছে, "সর্ব-মানবের সার্বভৌমত্ব।"

এই 'সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব' অর্জনের সংগ্রাম যে সাফল্য লাভ করেছে, তা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। তবু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের এখনো অনেক বাকী। দেশে দেশে আজো দেখি সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে তথা রাজনীতি ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত। আজো দেশে কিছুসংখ্যক ক্ষমতালোভী মুখে না বললেও কার্যকলাপে বিধিদত্ত সনদের দাবিদার। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যে জনসাধারণ বিদেশী শাসনের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়েছে, যে জনসাধারণ মায়ের অশ্রু, বোনের কান্না, স্ত্রীর বিলাপকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়েছে, প্রাণের বিনিময়ে যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে– আজ সেই জনসাধারণই স্বদেশী স্বৈরাচারী দ্বারা নির্যাতিত। তাদের পেটে অন্ন নেই,পরনে বস্ত্র নেই। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক জীবন ও মৌলিক অধিকার অশুভ শক্তির পদতলে নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত। জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার থেকে আজো তারা নির্মমভাবে বঞ্চিত।

তবু আমরা নিরাশ হব না। কেননা আমরা জানি, দুঃখের আঁধার রাত্রি কখনো চিরস্থায়ী হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস গণবিরোধী অশুভ শক্তির পদভারে বার বার কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু অপরাজেয় গণশক্তি বারে বারে বক্ষরক্তে সে কলঙ্ক মুছে দিয়েছে। সুতরাং সাম্প্রতিক ইতিহাসের কলঙ্ক মোচন করে সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করবেই। আমরা যারা ঘটমান বর্তমানের মনোযোগী পর্যবেক্ষক তারা জানি, দিকে দিকে আজ গণশক্তির অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছে। এই জাগরণের সারথী হচ্ছে তারুণ্য-তরুণের দল। যুগ যুগ ধরে তাদের দ্বারাই অসাধ্য সাধন হচ্ছে। আমি দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করি, এই দুরন্ত দুর্দম তরুণশক্তি কোথাও কোন অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যকে মেনে নেবে না। এই পৃথিবীকে তারাই করে তুলবে সুন্দর, তারাই বাস্তবায়িত করবে আবহমানকালের মানুষের স্বপ্ন ও সাধের সমাজ। এই তারুণ্যের শক্তিতে আস্থাবান হয়ে, তাদের সংগ্রাম ও সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কবির ভাষায় তাই বলব ঃ

.....মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব বলে যাব- এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
নাট্যের কবর-রূপে বাকী শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের আর অদৃশ্যের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে, দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

১৯৬৩ সালের ৮ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

www.pathagar.com

বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা

শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত ও পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা কর্মসূচি কোন কোন মহলে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আর যে যাই বলুন, আমি কিন্তু এই ৬-দফা পরিকল্পনায় নতুন কিছুই দেখি না। পরিকল্পনাটির সঙ্গে কেউ কেউ একমত হতে পারেন। আবার কেউ কেউ হয়ত ভিন্নমতও পোষণ করতে পারেন। তাই বলে, একথা কেউ বলতে পারেন না যে, এই কর্মসূচিতে যা বলা হয়েছে, তিনি আগে কখনো তা শোনেননি। মুজিবুর রহমানকে এতটুকু কৃতিত্ব দেয়া চলে যে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে জাতীয় সমস্যাবলি যখন নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় তিনি বিস্তারিত কর্মসূচিটি প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

১৯৫৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে নিয়াকত আলী খানের মৌলিক আদর্শ কমিটির সুপারিশের যে বিকল্প রিপোর্টটি গ্রহণ করা হয় তার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা স্বীকার করলেন যে, ঐ রিপোর্টেও এই একই ধরনের দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফাটিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি সুস্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সেদিন মুসলিম লীগই ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার, বিশেষ করে তার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি দু'টির বিরুদ্ধে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, নেজামে ইসলাম দলও সেদিন যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল ছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলতে গিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সেদিন সরকারি ক্ষমতা ও অর্থবল সব কিছুরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্বশক্তিতে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে তাঁরা সর্ব রকমে ও সম্ভাব্য সর্ব উপায়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। এমনকি, জনসাধারণকে হুঁশিয়ারির পর হুঁশিয়ারি দিয়ে এমন ঘোষণাও তাঁরা করেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির প্রতি যদি জনসাধারণ সমর্থন জানায়, তবে ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন হয়ে পড়বে। এত প্রচারণা, এত হুঁশিয়ারি

www.pathagar.com

সত্ত্বেও জনগণের আদালতের বিচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যুক্তফ্রন্ট দল নির্বাচনে শতকরা ৯৭টি আসন দখল করে। বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের সেদিনকার এই বিজয় সারা এশিয়ার বুকে এক নজিরবিহীন ঘটনারূপে পরিগণিত হয়। কারণ, স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম নির্বাচনী সংগ্রামে বিরোধী দলের মোকাবেলা করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন কোন দলের এমন করে সমূলে উৎখাত হওয়ার ঘটনা এশিয়ায় আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। স্বভাবতই, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম দলকে আজ যখন শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচিকে অভাবিতপূর্ব বা আকস্মিক একটা কিছু গণ্য করে হৈ-চৈ করতে দেখি তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি!

১৯৫৪ সালে প্রত্যক্ষ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কেউ সহজেই এ কথা বলতে পারে যে, আলোচ্য কর্মসূচির জনগণস্বীকৃত ভিত্তি সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন তোলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আর কারো নেই (অবশ্য বিস্তারিত খুঁটিনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়)। এতদসত্ত্বেও একজন উদারমনা গণতন্ত্রী হিসেবে এবং জনগণের উপরে অবিচল আস্থা আছে বলেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হওয়ার ব্যাপারে আমার অমত নেই; অবশ্য যদি এ প্রশ্নে সরাসরি গণভোট অথবা প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা হয়।

যাই হোক, কেবল যে পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবেই এই কথার উল্লেখ ছিল তাই নয়, পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁদের সুস্পষ্ট রায় জানিয়ে দিয়েছে। নতুন করে সেই প্রশ্নটিকে কেউ আবার তুলে ধরতে চাইলে তার এই উদ্যমের পিছনে দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করার অপচেষ্টা সত্যের প্রতি চরম অবিচারের শামিল।

গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার স্বীকৃত ; কিন্তু যে প্রশ্নে একবার জনমত যাচাই করা হয়েছে, সে প্রশ্নে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জনমতের সেই রায়কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেকের উচিত পরস্পর সহযোগিতা করা। রাষ্ট্রভাষা ও যুক্তনির্বাচনের প্রশ্নে এই ধরনের গণতান্ত্রিক মনোভাবই আমরা লক্ষ করেছি। স্বভাবতই প্রশ্ন করা যেতে পারে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সেই একই মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়নি বা দেওয়া হচ্ছে না কেন? আগে বহুবারই আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের কেউই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব পোষণ করে না।

এতদসত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতাবাদিতার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তার লক্ষ্য কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা। কে না জানে বা কে না বোঝে যে, পারস্পরিক স্বার্থে বা পারস্পরিক অস্তিত্বের খাতিরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক হয়েই বসবাস করতে হবে। দেশের উভয় অংশকেই সমানভাবে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। একতরফা উপলব্ধির কোন অবকাশ যেখানে নেই।

www.pathagar.com

ভৌগোলিক কারণেই পাকিস্তানের জীবনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই দাবির মোদ্দা অর্থ, দেশের উভয় অংশকে সমান স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী করার খাস করে পূর্ব পাকিস্তানকে কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া নয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যখনই কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া, এমনকি উর্দুর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচ কোটি অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার মত নির্দোষ দাবি যখন এই প্রদেশবাসী উথাপন করেছে, তখনই দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু লোক হৈ-চৈ শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছে; এমনকি যারা এ দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে 'শত্রুর চর' বলে আখ্যায়িত করেছে, আর সেই সঙ্গে অত্যাচার আর নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে। শত শত দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্র-যুবককে কারান্তরালে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তারই পাশাপাশি পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে তিন তিনটি ছাত্রকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। আবার যখন যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, তখনো ঠিক এই অবস্থাই দাঁড়ায়। দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ আর জনগণকে লক্ষ্য করে তখন কেবল গালি-গালাজই করা হয় না, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের উপরও নৃশংস হামলা চালানোর চেষ্টা চলে। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যা কিছুই বলা বা করা হোক না কেন, সে সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পিত একটা বিশেষ মানসিকতা নিয়ে এমনতরই ধুয়া তোলা হয় আর এমনতরই অত্যাচার ও নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় লোকের এই মানসিকতা কোনকালেই জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির অনুকূল হতে পারে না, এটা বুঝে নেওয়া কি এমনই কঠিন? আমার অনুরোধ, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত যে ৬-দফা কর্মসূচি সম্প্রতি দেশবাসীর সামনে পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সেই একই নিয়মে আবার যেন সেই ভ্রান্ত মনোভাবই প্রয়োগ না করা হয়। এই কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত না যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি দেশের আইন বইতে আজ স্থান পেলেও শুরুতে এই সমস্ত দাবি-দাওয়া দাবিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য শত শত এমনকি, কখনো কখনো হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে কারাগারে নিক্ষেপের মতন অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে তিক্ততার সৃষ্টি করা হয়েছে, আজও তার জের চলছে। অকারণে মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে বা আদালতে বিচারের ব্যবস্থা না করে তার নাগরিক ও মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করা হলে, মানুষের দেহ ও মনের উপর চরম নির্যাতন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের গোড়ায় কুঠারাঘাত করে। তবু সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে এহেন অত্যাচার-নির্যাতন হাসিমুখে গ্রহণ করার মতন মানুষের আজও অভাব নেই। অত্যাচার-নির্যাতন যতই কঠিন হোক, সংগ্রামী চেতনাকে তা হতোদ্যম করতে পারে না; বরং অত্যাচার-নির্যাতন যতই কঠোর হয়, সচেতন সংগ্রামী মানুষের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ততই দৃঢ় হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসই এই সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

www.pathagar.com

অতএব দেখা যাচ্ছে, আজ আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, অত্যাচার-নির্যাতন বা দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে সে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না বা সে ব্যবস্থাতে ৬-দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, তারও কোন সুরাহা হবে না। একই দেশের নাগরিক হয়ে একে অপরের আন্তরিকতা বা দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন সমীচীন নয়। অতীতে এক শ্রেণীর মানুষ এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এ দেশের মানুষে মানুষে এবং দেশের পরস্পর হতে দূরে অবস্থিত দুই অংশের জনসাধারণের ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছিল। যারা একদিন শেরেবাংলা ফজলুল হককে "বিশ্বাসঘাতক" বলে আখ্যায়িত করেছিল, তাদেরকেই কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁকেই আবার "দেশপ্রেমের মানস-পুত্র" বলে অভিনন্দিত করতে হয়েছে। আর যারা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেশপ্রেমে সন্দেহ করেছেন, তাঁরা দেশের তো নয়ই, নিজেদেরও কোন মঙ্গল করেননি। সংশ্লিষ্ট মহলকে তাই আমরা অনুধাবন করতে বলি যে, যখন আমরা দেখি যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন নেতা নেই, যাঁকে কোন না কোন সময় "দুর্নীতিপরায়ণ" বা "শত্রুর চর" বলে আখ্যায়িত করা হয়নি, তখন আপনাদের মনোভাব কি দাঁড়ায়? জিজ্ঞেস করি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ধন-দৌলত বা বিষয়-সম্পত্তি বলতে কি রেখে গেছেন?

পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করার জন্য মহল বিশেষে আমরা একটি বিরামহীন প্রবণতা লক্ষ করে আসছি ; অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, মুসলিম বাংলার নেতৃত্ব এই প্রদেশের রাজনীতি-সচেতন মানুষ না হলে আদৌ পাকিস্তানই অর্জিত হত না। পাকিস্তান কারও দান নয়, কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রও নয়। কেবল জনগণের দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য স্পৃহার জোরেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

সংগ্রামের সূত্রে আমরা এমন অনেককে চিনেছি, যারা পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের নিন্দা করে, যারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাচ্ছিল্য করতে চায়। এরা সেই শ্রেণীর লোক, যারা কোন ন্যায্য দাবি উঠলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে রাজনীতিকদের উদারতার সুযোগে পাকিস্তানে 'কায়েমী স্বার্থের' একটি চক্র গড়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেই কায়েমী স্বার্থবাদী মহলটিই এখন সেই রাজনীতিকদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে চলছে। বিশ্বের 'নির্যাতিত' মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তারা অত্মোৎসর্গ করতেও পিছ-পা নয় বলে প্রচার করে, অথচ নিজের দেশের জনগণের অধিকার প্রদানের প্রশ্নে তারাই আবার মারমুখী; স্বার্থবাদী এই চক্রটির পীঠস্থান হলো পশ্চিম পাকিস্তান। অবশ্য এই পাদপীঠ পূর্ব পাকিস্তানে হলেও তাদের কার্যকলাপের কোন তারতম্য হতো না; কারণ স্বার্থবাদী চক্রের দৃষ্টিভঙ্গি সবখানেই এক ও অভিন্ন।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতেই আমরা পরিচালিত হব, না সুস্থ মানসিকতা, যুক্তিধর্মিতা এবং জনগণের ইচ্ছা-অভিলাষকেই আমরা রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিফলিত হতে দেব? কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হয়ত মনে করতে পারে যে, দেশের আপামর জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে কেবল পিছনে ফেলে দিতে পারলেই নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখে তারা ফুলে ফেঁপে উঠতে পারবে। এই যখন অবস্থা, তখন কায়েমী স্বার্থীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দু'টোর মধ্যে একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে। আমার স্থির বিশ্বাস, জনগণের ইচ্ছাকে যদি প্রতিফলিত হতে দেওয়া হয় তবে ৬-দফা কর্মসূচি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, কোনটি সম্পর্কেই কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না। কেননা, এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতার বিধান হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের তাতে আপত্তি থাকতে পারে কি? জবাবে বলব, না। পাকিস্তানে এমন কে আছে, যে চায় না যে, দেশের উভয় অংশই সমভাবে উন্নত হোক এবং উভয় অংশই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করুক? ৬-দফা পরিকল্পনার কোথাও যদি আপত্তিকর কিছু থাকে, পাকিস্তানের সংহতি বিপর্যস্ত হতে পারে এমনকিছু যদি তাতে থাকে, তা'হলে দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে সহজেই সে প্রশ্নের ফয়সালা করতে পারেন। আমার বিবেচনায় ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের এটাই সর্বোত্তম পথ।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দোষারোপ করার আগে স্মরণ রাখা উচিত যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছে। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই দেশের অবস্থা এবং উভয় অঞ্চলের জনগণের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্তরিকতার প্রমাণ মিলবে। দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তা আজ আর কারো অজানা নেই। কেবল আশ্বাসবাণী দিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে এই পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য দূর করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে উভয় অঞ্চলের অবস্থা যাতে সমানুপাতে করা যায় তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আত্মপরিচালিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ৬-দফা কর্মসূচিটি বিবেচনা করে দেখার জন্য আহ্বান জানাই। আসুন, কে এই কর্মসূচির প্রণেতা, আপাতত তা ভুলে গিয়ে আমরা পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে ৬-দফা কর্মসূচির গুণাগুণ বিচার করে দেখি। স্বায়ত্তশাসনের দাবি বা ৬-দফা কর্মসূচি কোন আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিক মহলের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, এরূপ ধারণা পোষণ করে আত্মপ্রবঞ্চনার কোন অর্থ নেই। বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নেয়া হোক। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি অত্যন্ত জীবন্ত দাবি। এখানকার মানুষ এ দাবিকে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলেই মনে করে। এ প্রশ্নে যাদের সন্দেহ আছে বা যারা এখনো অজ্ঞতায় ভুগছে, তারা জনগণের

www.pathagar.com

দরজায় গিয়ে তাদের মতামত যাচাই করুক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং দেশ রক্ষার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং উভয় অঞ্চলই যদি সমান রাজনৈতিক অধিকার পায় তবে আকাশ ভেঙে মাথায় পড়বে না, বরং তাতে পাকিস্তান আরো শক্তিশালী হবে।

সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানি জওয়ানরা তাদের শৌর্য ও বীর্যবত্তার প্রমাণ দিয়েছে এবং বাঙালিরা সাহসী ও যোদ্ধার জাত নয় বলে এতদিন যে বানোয়াট অপবাদ রচনা করা হয়েছে তারও অবসান ঘটিয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ৬-দফা কর্মসূচি দেখে আঁৎকে উঠার বা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আসুন, আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণু মন-মানসিকতা নিয়ে প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করি, বিচার করি। সংশ্লিষ্ট সকলে পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য ও মতামত বুঝবার ও সম্যক উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন। প্রত্যেক ব্যাপারে যারা আমাদের সন্দেহ করে তাদের কাছে আমি একটি পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পশ্চিম পাকিস্তান যদি আজকের এ পর্বত-প্রমাণ বৈষম্যের শিকার হতো, তা'হলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হতো? তাই তাদেরকে বলব, ধৈর্যশীল হোন, যুক্তিবাদী মন দিয়ে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করুন। আমি তাঁদের আহ্বান জানাই, "নিজে বাঁচুন অপরকেও বাঁচতে দিন।" এ নীতিবাক্য কেবল কথায় নয়, কাজেও বিশ্বাস স্থাপন করুন। তা'হলেই কেবল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই পূর্ণ সহযোগিতা ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সন্দেহ ও দমননীতির দ্বারা কিছুই হাসিল করা যাবে না; তাতে বিরোধের মাত্রাই কেবল বাড়বে।

ইত্তেফাক, ৪ মার্চ, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

সার্বভৌম বাংলা থেকে গৃহযুদ্ধ

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান জনগণের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে, বিশেষ করে ৬-দফা কর্মসূচিকে 'বৃহত্তর স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গ' প্রতিষ্ঠার এক ভয়াবহ স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন। সেই সাথে তিনি এই দাবি করেছেন যে, "পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশই তাদের কোন অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হতে না দেওয়ার মত যথেষ্ট শক্তির অধিকারী।" তারপর তিনি চরমে পৌঁছেছেন ঃ "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা" অর্থাৎ শক্তিশালী স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চান, তাঁরা চাপিয়ে দিলে দেশবাসীকে তিনি দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য এমনকি গৃহযুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ মর্মেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যদি যুক্তি মানতে রাজি না হয়, তা হলে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট অনেক কথাই বলেছেন এবং সেই সব কথা তিনি গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই বলেছেন। একই নিয়মে তাঁর সেই সব 'কথার' বহু প্রচারও করা হয়েছে। কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খান যদি কেবল কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি হতেন তবে জনসাধারণ তেমন উদ্বেগ বোধ করত না। কিন্তু, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও বটেন, সেহেতু তাঁর পক্ষে এ সব কথা বলা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু যখন আইয়ুব খানের মতন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহযুদ্ধের ভাষায় কথা বলবেন বা এমন সব উক্তি করবেন যাতে এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর বা একের বিরুদ্ধে অপরকে ক্ষেপিয়ে তোলার কারণ ঘটে, তখন এটি অপেক্ষা বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে? আন্তর্জাতিক বিরোধ বা দুই দেশের পারস্পরিক বিরোধ যদি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা বা সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করাই সমীচীন হয় (বলাবাহুল্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজেও এ অভিমত সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন), তা হলে আমাদের নিজের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ বিতর্কমূলক সমস্যা সমাধান করতে লাঠি, ছোরা বা বুলেটের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, এটি অপেক্ষা দুঃখজনক কথা আর কি হতে পারে? নিজেদের দেশেই যদি আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তবে অন্য দেশের সাথে শান্তিতে বসবাস করবার আশা আমরা কিভাবে করতে পারি?

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রবর্তিত প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন-পদ্ধতিই বলুন, আর পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনব্যবস্থাই বলুন অথবা স্বায়ত্তশাসনের মৌল আদর্শভিত্তিক ৬-দফা কর্মসূচিই বলুন, সবই দেশের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কের আওতায় পড়ে। এ সবই আলোচনা সাপেক্ষ এবং আলোচনার মাধ্যমেই এ সব প্রশ্নে সর্ববাদীসম্মত একটা মতামত নিরূপণ করা যেতে পারে। একবার যদি কোন পদ্ধতির পক্ষে সর্ববাদীসম্মত মতামত যাচাই হয়, তবে বৃহত্তর কল্যাণের ও দেশের গৌরবের খাতিরে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। ৬-দফা কর্মসূচি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি; খোদা প্রদত্ত বা অন্যবিধ কোন কর্মসূচি নয়। এ কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মতের প্রতিধ্বনি থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অনুমোদন গ্রহণ এখনও বাকী। তারা হয়তো পুরাপুরিই এ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে, অথবা এখানে-সেখানে কিছুটা রদ-বদলও চাইতে পারে। যারা এ কর্মসূচির বিরোধী অথবা যাদের নিকট এটা রক্ত বর্ষণের শামিল, জনগণের নিকট গিয়ে তাদেরও নিজ মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে বল প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে নয়, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, জনগণের নিকট ৬-দফা কর্মসূচির সমালোচকদের কোনই আস্থা নেই এবং কোন কর্মসূচি অথবা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কোন পদ্ধতির প্রশ্নে জনগণই যে চূড়ান্ত রায়ের মালিক, এ কথাও তারা স্বীকার করেন না।

কথা হল, আসলে ৬-দফা পরিকল্পনার লক্ষ্য কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থকে বুলন্দ করবার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে জনসাধারণকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে দেশের দুই অঞ্চলের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা ও সমান ক্ষমতা নিজ নিজ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা তত্ত্বতদারকের অধিকারী করে জাতীয় জীবনে অধিকতর ঐক্য ও সংহতি বিধান এ কর্মসূচির লক্ষ্য। দেশকে দুর্বল করা নয়, বরং দেশের দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অংশীদারিত্বের মনোভাব সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করে দেশ ও রাষ্ট্রকে সত্যিকার শক্তিশালী করাই ৬-দফা কর্মসূচির মর্মকথা।

৬-দফা পরিকল্পনা বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বৃহত্তর যুক্ত ও সার্বভৌম বাংলারই আর এক ব্যাখ্যা, এমন কথা বলা ন্যায় ও সত্যের অপলাপ বৈ নয়। ব্রিটিশ ও অমুসলিম কায়েমী স্বার্থের নিগড় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার অর্জনের জন্যই বিশ্বের এই অংশের জনসাধারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। এই অবস্থায় আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কোন এক পর্যায়ে বিভাগ-পূর্ব যুগের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহি, এইরূপ যদি কেহ চিন্তা করে, তবে তাহাকে পাগলামী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

৬ দফা কর্মসূচির সহিত একমত না হওয়ার পূর্ণ অধিকার প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আছে। ব্যক্তি হিসাবে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সম্পর্কে তিনি নিজস্ব মতামত পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু ৬-দফা পরিকল্পনার উদগাতা ও সমর্থকদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলে এবং তাহারা পাকিস্তানকে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অপমানকর বলিয়াই সর্বমহলে নিন্দিত হইবে।১৯৫৯ সালে কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ভারতের সহিত "যুক্ত দেশ-রক্ষা ব্যবস্থারও" প্রস্তাব দিয়া বসেন। অনেকেই উহাকে ভালো চোখে দেখেন নাই। এতদসত্ত্বেও কেহই তাহার দেশপ্রেম চ্যালেঞ্জ করেন নাই এবং এমন কথাও কেহ বলেন নাই যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব দ্বারা পাকিস্তানকে বিকাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

www.pathagar.com

উপভোগ্য ব্যাপার হইল, পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই এমনই শক্তিশালী যে, তাহাদের কেহই তাহাদের কোন অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজেই যখন দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছেন, তখন এত আত্মপ্রত্যয় ও জ্ঞান-গম্যি সত্ত্বেও তিনি বা অন্য কেহ ৬-দফার প্রশ্নে এত উদ্বিগ্ন কেন? তাঁহাদের সরকার বা ভারত সরকার কি করিবেন বা না করিবেন, সেই কথা না তুলিয়াই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে আমরা আশ্বাস দিতে পারি যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের দেশের এক ইঞ্চি ভূমিও কোন বিদেশী শক্তির পদানত হইতে দিবে না। এমনকি গৃহযুদ্ধের মোকাবেলা করিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানাইতে গিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আমেরিকার গৃহযুদ্ধের নজির টানিয়াছেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমি বা কারণ লইয়া এই পর্যায়ে আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাহি না; কিন্তু যেই ব্যাপারটি আমাদের নিকট উদ্ভট ঠেকিয়াছে তাহা হইল এই যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, যিনি গণতন্ত্র ও সরকারি কাঠামোর প্রশ্নে কোন বিদেশী পদ্ধতি বা ট্র্যাডিশনের অনুকরণ করিতে চাহেন না এবং চাহেন না বলিয়াই যিনি আমাদের দেশের "প্রতিভানুগ" একটি নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে চাহেন, তিনিই আবার এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস হইতে প্রেরণা লাভের প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু প্রশ্নটি তিনি যখন উত্থাপন করিয়াছেনই তখন আমরা কি তাঁহার নিকট হইতে এইটুকু আশা করিতে পারি, যে রাজনৈতিক পদ্ধতির বলে মার্কিন জাতি আজ বিশ্বের সেরা শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন? যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মধ্যে তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয় এবং কাহার নিকটইবা তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হয়?

আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোগী 'পাকিস্তান অবজার্ভার' উহার "একটি গুরুতর" শিরোনামায় শাসনতান্ত্রিক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ১৯৫৮ সাল হইতে একান্ত অসহায়ের মতন পাকিস্তানে আমরা যে রাজনৈতিক নাট্যাভিনয় দেখিয়া আসিতেছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন ঃ আমাদিগকে কি ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে যে, মোগল শাসনের গোড়ার দিকে এই দেশে যে শাসন-পদ্ধতি ছিল তিনি (ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব) সেই পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী? নিজ সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি রক্ষা এবং এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত জনগণের প্রতি তৎকালীন সম্রাটদের তো আর কোন দায়িত্বই ছিল না; সেকালে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ইহার অতিরিক্ত আর কোন পরিচয় ছিল না। শাসক ও শাসিতের এই ধরনের সম্পর্ক মধ্যযুগেই প্রচলিত ছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উহার বিলুপ্তির আলামত প্রকাশ পাইতে থাকে। আজ দুনিয়ার কোথাও এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই সেকেলে ও পরিত্যক্ত পদ্ধতির রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপনের মত সাহস রাখেন।

ইত্তেফাক, ২৫ মার্চ, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

যুবশক্তিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে

গত কিছুকাল যাবৎ আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ । চলাফেরা করাও চিকিৎসকের নিষেধ। তবু রাজবাড়ীর ছাত্রবন্ধুদের আন্তরিকতা আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। তাই শরীরের উপর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আজ আমি এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি। রাজবাড়ী কলেজের নব-নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের আজকের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম আমি অভিনন্দন জানাই তোমাদেরকে যারা এবারকার নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে কলেজ ছাত্র-সংসদের কর্মকর্তা হয়েছো; আর আবেদন করব তোমাদের কাছে যাতে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে কলেজের সাধারণ ছাত্রদের তোমরা আগামীদিনের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি যেন না কর। তোমাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক, সত্যিকার বিবেকবান নাগরিক হয়ে দেশের, দশের ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে তোমরা আত্মনিয়োগে সক্ষম হও, করুণাময়ের দরবারে এই কামনাই করি।

যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ আমি ছাত্রবন্ধুদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছি, তা কোন রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। তাই, নিজ বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। ছাত্রবন্ধুদের সমস্যার পাশাপাশি যে দু'একটি কথা একেবারে না বললেই নয়, কেবল তাই আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আমার দেশের তরুণ সংগ্রামী ছাত্রসমাজেরই একাংশের সামনে দাঁড়িয়ে কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। বিভাগ-পূর্ব যুগের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকার পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের ভূমিকার কথা ভাবতে গেলে গর্বে আজ আমার বুক ভরে ওঠে। যখন ভাবি, স্বাধীনতা অর্জনের পর এক এক করে দীর্ঘ একুশ বছর পেরিয়ে এসেও আমার দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই ছাত্রসমাজকে আজও কেন সংগ্রামের ময়দানে পদচারণা করতে হচ্ছে, তখন সীমাহীন ব্যথাবেদনায় আবার মুষড়ে পড়ি।

ছাত্রদের সম্পর্কে কথা বলতে সত্যিই ভয় হয়। এমনিতেই ক্ষমতাসীন মহল প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে চলেছেন যে, ছাত্ররা রাজনীতি করছে। ধিক্কৃত রাজনীতিকরা নাকি তাদেরকে রাজনীতি চর্চায় উস্কানি দিয়ে দেশকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছেন। পানির মত অর্থ ব্যয় করেও সরকার ছাত্রদেরকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করতে পারছেন না। পরীক্ষায়

www.pathagar.com

অসদুপায় অবলম্বন, শিক্ষকদের প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে সরকার রীতিমত বিচলিতও বোধ করছেন। এসব ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের জন্য অভিভাবকমণ্ডলীর কাছে আবেদন-নিবেদন করেও নাকি কোন ফায়দা হচ্ছে না। সরকারের এ অভিযোগ সত্য কি অসত্য, সেই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমি প্রশ্ন করব, সরকার বর্ণিত এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে বিচার করলে প্রশ্নের জবাব পাওয়া কি খুবই কঠিন? কঠিন আদৌ নয়। দায়ী ছাত্ররাও নয়, শিক্ষকও নন, এমনকি অভিভাবকমণ্ডলীও নন। প্রশ্ন হল, তা' হলে দায়ী কে? এই প্রশ্নের আলোকেই পরিস্থিতি বিচার্য।

সাধারণ অবস্থায় ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা অনুচিত, আর অধ্যয়নই তাদের একমাত্র তপস্যা, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থাটা আজ কী? স্বাধীনতা অর্জনের পর বিশটি বছর পেরিয়ে গেলেও ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের অবস্থা পরাধীন আমলের অবস্থার চাইতে কোনও অংশে কি উন্নত হয়েছে, না তার আরও অবনতিই পরিদৃশ্যমান? অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিল, আর জাতির জনক মিঃ জিন্নাহ্ তার যে চিত্ররূপ দিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন কি আমাদের সফল হয়েছে? জাতির জনক সেদিন বলেছিলেন, You go anywhere to the country-side. I have visited villages, there are millions and millions of our villagers who hardly get one meal a day. Is this civilization? Is this the aim of Pakistan? Do you visualise that millions have been exploited and cannot get one meal a day! If that is the idea of Pakistan I would not have it .....

তিনি আরও বলেছিলেন ঃ I am sure, democracy is in our blood. It is in our marrows ....আর,

The constitution of Pakistan can only be framed by the millat and the people. Prepare yourselves and see that you frame a constitution which is your heart's desire. The constitution and the Government will be what the people will decide.

শুধু কি তাই? ঈপ্সিত আবাসভূমির ছক কাটতে গিয়ে জাতির জনক আরও বলেছিলেন, I should like to give a warning to the landlords and capitalists who have flourished at our expense by a system which is so vicious, which is so wicked and which makes them so selfish that it is difficult to reason with them. The exploitation of the masses have gone deep into their blood. They have forgotten the lessons of Islam. Greed and selfishness have made these people subordinate to the interest of other's in order to fatten themselves. If they are wise they will have to adjust themselves wih the new modern conditions of life. If they don't, God help them; we shall not help them.

www.pathagar.com

জাতির জনকের এই তিনপ্রস্থ ঘোষণার পাশাপাশি আমাদের বর্তমান অবস্থার তুলনা করুন। জবাব পাবেন, আমার দেশের তরুণ ভাইয়েরা কেন আজও রাজনীতির ময়দানে পদচারণা করে; করে নয়, করতে বাধ্য হয়। কেন তারা শত নির্যাতনের মুখেও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কার কখন রাজনীতি করা সাজে বা সাজে না, সে সম্পর্কেও সে সময় জাতির জনক বলেছিলেন ঃ

"আমাদের দেশে রাজনীতি দেশের মানুষের পক্ষে জীবন-মরণের উপযোগী খাদ্যাখাদ্যেরই মত। কতকটা পাকস্থলীর রক্তই বলা চলে। কাজেই, কাউকে রাজনীতিতে নামতে না বলা বাতুলতা মাত্র। ..... ছাত্রসমাজ কখনও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারে না। যত শীঘ্র সম্ভব তাদেরকে রাজনীতি বুঝতে হবে, রাজনীতি শিখতেও তৎপর হতে হবে।"

এর আলোকে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? দেখি দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আজ অবর্তমান। তথাকথিত উদ্দীপ্ত শিক্ষাদশকের চোখ-ঝলসানো অনুষ্ঠান আয়োজন ও সোচ্চার প্রচারের মধ্যেও একটি সত্য কেবল প্রকট হয়ে ভাসতে থাকে। সে সত্যটি হলো, আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার। বলতে গেলে সে হার যথা পূর্বং তথা পরং। আবার দারিদ্র্যের দিক দিয়ে তার অবস্থা বলতে গেলে সর্বোচ্চ। সরকারি মুখপত্র ও প্রচার-যন্ত্রের ঢালাও প্রচারের মধ্যেও পরিকল্পনা কমিশনের মুখপাত্রদের মুখে আমরা শুনি, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অধীনে আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত খাত হলো শিক্ষা। এই খাতে যে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগই ফজুল ব্যয় (waste) হবে। তাঁদের মুখে আমরা আরও শুনি, আমাদের দেশে স্কুলে প্রবেশের পর ক্লাস ফাইভ-এর শিক্ষা শেষ করেই শতকরা ৮২ জন ছাত্র শিক্ষাজীবন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা মাধ্যমিক স্কুলে নাম লিখিয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট কোর্স পরিসমাপ্তির আগেই তাদেরও শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন স্কুল ছেড়ে যায়।

তথাকথিত উন্নয়ন দশকের মাত্রাহীন প্রচারের পাশাপাশি আমরা আরও দেখতে পাই, ১৯৬১ সালেও সারা দেশের গ্রাজুয়েটের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি গ্রাজুয়েট-এর হার ছিল ৫০.২, পরবর্তী বছর তা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৮.১ জনে। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রের সংখ্যা বরাবরই অনেক বেশি হলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রের হার শতকরা মাত্র ৩৮।

খাস রাওয়ালপিণ্ডির বুকে অনুষ্ঠিত আমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীর এক সম্মেলনেও সরকারের শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা শুনেছি। তাঁদের মতে দেশের শিক্ষানীতি যে পথে এগিয়ে চলছে, তা বিজ্ঞানচর্চা বা গবেষণামূলক শিক্ষার অনুকূল তো নয়ই, এমনকি মোটামুটি জাতীয় লক্ষ্য অর্জনেরও তা অনুকূল নয়। বহু স্বল্পোন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে তাঁরা বলেছেন যে, বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক শিক্ষার ব্যাপারে সে সব দেশের ব্যয়ের পরিমাণ যেখানে জাতীয় আয়ের শতকরা এক থেকে তিনভাগের মধ্যে, আমাদের দেশের ব্যয় সেখানে জাতীয় আয়ের .২০ ভাগ মাত্র।

www.pathagar.com

মন্ত্রী-গভর্নররা বলে বেড়াচ্ছেন, শিক্ষাখাতে ও ছাত্রকল্যাণে সরকার মুক্ত হস্তে ব্যয় করছেন। পার্লামেন্টারি আমলের তুলনায় তাঁদের আমলে ব্যয় কত গগনচুম্বী তারও ফিরিস্তি তাঁদের মুখে মুখে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এসব কথা আমি এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চাই না। পরিকল্পনা আর মহা পরিকল্পনার নামে তাঁরা দেশকে বিদেশের কাছে বন্ধক রেখে মুক্ত হস্তে যে ব্যয় করছেন, তাতে জাতির কী লাভ হচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের ফায়দা ব্যতীত দেশের কোন কল্যাণের পথ তাতে প্রশস্ত হচ্ছে কী? তৃতীয় পরিকল্পনায় কথা ছিল, পরিকল্পনাকালে দেশে ১৩১১টি নয়া প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিন বছর পেরিয়ে যাবার পর শুনি, তার মধ্যে মাত্র ২০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। কথা ছিল, পরিকল্পনাকালে দেশের প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৩০ লক্ষের মত বৃদ্ধি পাবে। তিন বছর পেরিয়ে যাবার পর দেখি, সে লক্ষ্যের মাত্র ৯ ভাগ হাসিল করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার নতুন ছাত্র স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল, এ পর্যন্ত তার শতকরা মাত্র ২৫, ৩৬ ও ২৩ ভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে স্কুল-কলেজের অভাবে ছাত্র ভর্তির সমস্যা যখন উৎকট আকার ধারণ করেছে, তখন নতুন নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সরকার প্রদেশের সবচেয়ে পুরাতন সম্পদশালী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এক এক করে প্রাদেশিকীকরণ করে চলেছেন। চলতি পরিকল্পনাকালে তাঁরা প্রদেশের ৩২টি ডিগ্রী কলেজ সরকারি আওতায় নেবার এক মহতী পরিকল্পনা নিয়েছেন। গত এক বছরেই তাঁরা এই ধরনের ১১টি কলেজ নিজেদের আওতায় নিয়েছেন। প্রদেশের সবচেয়ে নামকরা কলেজগুলো আজ সরকারি আওতায়। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বরিশালের বি. এম কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ, পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, দৌলতপুর কলেজ, এমনকি প্রদেশের বৃহত্তম ঢাকার জগন্নাথ কলেজও আজ তার বেসরকারি মর্যাদা হারিয়ে 'সরকারি' মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাভাবে যেখানে বহু স্কুল-কলেজের নাভিশ্বাস উঠেছে, সেখানে এভাবে সচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে হাতে নিয়ে হয়তোবা ক্ষমতার দাপট দেখানো যেতে পারে, কিন্তু ছাত্র ও অভিভাবকদের তাতে কোন ফায়দা নাই, বরং কয়েক হাজার ছাত্র ও অভিভাবক নতুনতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যে জগন্নাথ কলেজে এতদিন ১২ হাজার ছাত্রের স্থান সংকুলান হত, এখন সেখানে স্থান সংকুলান হবে মাত্র দুই হাজার ছাত্রের। ওদিকে কারমাইকেল কলেজের ছাত্রের আসন শতকরা ৫০ ভাগ এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের শতকরা ৬৭ ভাগ হ্রাস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে প্রদেশে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে।

অন্যদিকে তাকালে আবার দেখা যাবে, এদেশের ছাত্র সমাজ একদিন বুকের রক্ত ঢেলে যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করেছিল সেই ভাষার প্রশ্নেও নতুনতর বিতর্ক সৃষ্টির একটা সূক্ষ্ম চাল চলেছে। কোমলমতি ছাত্রসমাজ প্রকৃতগতভাবেই অনুভূতিপ্রবণ। সুতরাং এ বিতর্কে যদি তাদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়, তবে বিস্মিত

www.pathagar.com

হওয়া চলে না। বরং ছাত্রদের কোন ব্যাপারে নির্লিপ্ত রাখতে হলে নতুনতর কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি থেকে ক্ষমতাসীন মহলের সর্বপ্রযত্নে বিরত থাকাই বিধেয়। এমনকি তাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, এমন কিছু অন্য কোনও মহল যাতে না করে, সেদিকেও সরকারের লক্ষ রাখা কর্তব্য।

পরীক্ষায় ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বন নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। অথচ পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই সরকারের সামনে এটিও একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকে আবার প্রবন্ধ ফেঁদে এর সব দায়িত্বই ছাত্র ও অভিভাবকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করতে চেষ্টা করছেন। কর্তাব্যক্তিরা মাঝে মাঝে ছাত্র ও অভিভাবকমণ্ডলীর প্রতি চরিত্র সংশোধনের হিতোপদেশ দিচ্ছেন, কখনওবা ভর্ৎসনাও করছেন। কিন্তু কেউ কি কখনও গভীরে নেমে সমস্যাটির মূল কোথায় তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন? পরাধীন আমলে স্কুল-কলেজে ছুটির একটা বাঁধাধরা নিয়ম ছিল। শিক্ষকদের আয়ের অংকের সঙ্গে মোটামুটিভাবে বাজারদরের সংগতি থাকায় শিক্ষকের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষণের ব্যাপারে ছাত্রদের প্রতি তাঁরা একাগ্রতা ও নিয়মনিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। সেকালের কোচিং ক্লাস ও হোমটাস্কের রেওয়াজ আজ একরকম উঠেই গেছে। এর কারণ ছেলে-মেয়ের সংসারে বাজারদরের সংগতি রেখে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনাকে আমাদের শিক্ষকরা আজ আর পবিত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন। যাঁদের হাতে জাতির আগামীদিনের নাগরিকদের হাতেখড়ি, সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা আজ অকল্পনীয়। মানবেতর জীবনই যেন তাঁদের ভাগ্যলিপি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকমণ্ডলীর অবস্থাইবা কি? শিক্ষক জীবনের পাশাপাশি একাধিক প্রাইভেট 'টিউশনি' অথবা কোন 'সাইডবিজনেস' ব্যতীত তাঁর সংসার চালানোই দায়। এত সবের মধ্যে তাঁদের কাছ থেকে ছাত্রদের ব্যাপারে কতখানি একাগ্রতা বা সুবিচার আশা করা চলে, তা আজ খতিয়ে দেখা দরকার।

তার উপর রয়েছে আর এক ধরনের খড়্গ। নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছাত্ররা যদি স্ট্রাইক করে একদিন, তবে শিক্ষায়তনে তালা পড়ে মাসের পর মাস। লাঠি-গুলি চালনার কথা নাইবা বললাম। স্বভাবতই বর্ষশেষে দেখা যায়, যে সিলেবাসে তাদের পরীক্ষা দিতে হয়, প্রায় শিক্ষায়তনেই তার শতকরা অন্যূন ৪০ ভাগই থেকে যায় ছাত্রদের অপঠিত। অথচ, প্রশ্নপত্র তৈরি হয় সমগ্র সিলেবাসের ভিত্তিতে। এ অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছাত্রদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর কী? তাই বলি, কেবল ছাত্র ও অভিভাবকমণ্ডলীর উপর দোষারোপ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। স্কুল-কলেজের ছুটির বহর, সিলেবাসের কলেবর ও ছাত্রদের পঠিত অধ্যায়ের সঠিক পরিমাপের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করার দরকার রয়েছে। কেবল তাহলেই সরকার কথিত এ সমস্যার মূল কোথায়, কে তার জন্য দায়ী, তা উদঘাটন ও সমস্যার প্রতিকার নির্দেশ করা সম্ভব হবে। অপরের ছিদ্রান্বেষণে সমস্যা কেবল বাড়বেই, কমবে না।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলে পারছি না। ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার হিতোপদেশের পাশাপাশি অভিভাবকমণ্ডলী যখন দেখেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতি লিখিত বা অলিখিত নির্দেশ জারি করে পয়সার প্রলোভন দেখিয়ে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের শহরের রাজপথে বা বিমান বন্দরে ভি-আই-পি সংবর্ধনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখার রেওয়াজ প্রবর্তন করা হচ্ছে, তখন তাঁরা বিচলিত না হয়ে পারেন কি? আবার বিষয়টির প্রতি যখন বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তাদেরকে সম্মানিত ব্যক্তিদের ইজ্জত করতে শেখার মধ্যে অন্যায়টা কি, এমন মন্তব্য করতেও শুনি। এ কি ছাত্রদের রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত রাখার হিতোপদেশের সাথে সংগতিপূর্ণ? কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি 'ছাত্রদল' গঠনের কথা এবং তাদের ভূমিকাও তো কারও অজানা নয়।

এতো শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভিভাবকমণ্ডলীর দিকে তাকালেইবা কী দেখা যায়? দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নিদারুণ প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত নন। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি, বই-পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য, সব মিলে সংসার-চিন্তায় প্রায় পরিবারেরই আজ নাভিশ্বাস অবস্থা। আজকের এ দুর্মূল্যের বাজারে অভিভাবকমণ্ডলীর আয়ইবা কতটুকু বেড়েছে? মাথাপ্রতি আয়ের বিচার করলে তো দেখা যায়, ১৯৫৯-৬০ সালের পর থেকে সমগ্র পাকিস্তানের হিসেবে মাথাপ্রতি আয় বেড়েছে যেখানে ১৭৭ টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানিদের মাথাপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ (কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ত্ব অফিসের বুলেটিন মতে) মাত্র ২২ টাকা। এই অবস্থায় ছাত্র ও অভিভাবকমণ্ডলীর উদ্দেশে যত হিতোপদেশই প্রদান করা হোক না কেন, সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। কেননা, সমাজের কিংবা অভিভাবকমণ্ডলীর অর্থনৈতিক অবস্থার টানাপোড়েন থেকে ছাত্রসমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় স্থিতিশীলতার অভাব ঘটলে ছাত্রসমাজও পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে না। কেননা, সব অর্থেই তারা জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জাতির দুর্দিনে, সত্য ও ন্যায়ের অবমাননায়, মানবতার মৃত্যুদশায় সমাজের সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, সচেতন ও সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে ছাত্ররাই এগিয়ে আসে সর্বাগ্রে সংগ্রামের ময়দানে। গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থচিন্তা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। এই কারণেই দেখা যায়, দেশে দেশে নিজেদের বুকের রক্তের বিনিময়েও তারাই সমাজ ও জাতিকে সঠিক পথের নিশানা দিয়েছে। রাজনৈতিক মহল যখন বিভ্রান্ত, বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন খেই হারিয়ে আত্মবিক্রীত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন ছাত্ররাই এগিয়ে এসেছে মৃতপ্রায় হতোদ্যম জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধান দিতে। পাকিস্তান আন্দোলনকালেও তাই ছাত্রসমাজকে জাতির জনক আহ্বান করেছিলেন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সংগ্রাম শেষে অকুণ্ঠচিত্তে তাঁদের গৌরবদীপ্ত ভূমিকার জন্য মোবারকবাদও জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে শিক্ষাঙ্গনে ফিরে গিয়ে নির্লিপ্ত মনে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আশা ছিল, ওয়াদামাফিক গণকল্যাণমুখী

www.pathagar.com

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ছাত্রদেরও আর সংগ্রামের ময়দানে নামতে ও গোলাগুলির সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সেদিন ছাত্রসমাজকে রাজনীতির ময়দানে শরীক হতে হয়েছিল, আজিকার পারিপার্শ্বিকতা কি তা থেকে ভিন্ন, না আরও অধঃপতিত? তাদের শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাই কি আজ কম? তার উপর রয়েছে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চাপ। সব মিলে চারপাশে যে দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর ও ভীতিপ্রদ পরিবেশ আজ বিরাজ করছে, তাতে আমরা যারা জীবনের বৃহত্তর অংশ কাটিয়ে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, তাঁদের পক্ষে বাকীটা জীবন হয়তোবা তাইরে-নাইরে করে কাটিয়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু দেশের যারা ভবিষ্যৎ, সমগ্র কর্মজীবনটাই যাদের ভবিষ্যতের গর্ভে, তাদের পক্ষে পারিপার্শ্বিকতার নীরব দর্শক হয়ে থাকা কি সত্যিই সম্ভব? বাস্তবতার মাপকাঠিতেই আজ তা বিচার করতে হবে। যে সমস্যা আজ সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে বসেছে, সে সমস্যার প্রতিকার ব্যতীত সমাজের সর্বাধিক নিঃস্বার্থ ও সচেতন গোষ্ঠী হিসেবে কী করে তারা আজ নির্লিপ্ত থাকবে, বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি তাদের নিজেদের স্বার্থও যখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত?

ছাত্ররা আমাদের ভবিষ্যৎ–তারাই আমাদের আগামী দিনের নেতা, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী। ভবিষ্যতের দেশ গঠনের দায়িত্বও তাদেরই। এ ভূমিকায় তারা যাতে যথাযথ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে, তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে কোটারী-স্বার্থমুক্ত স্বাভাবিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ।

অনেকে হয়তো বলবেন, এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে ইউরোপ, আমেরিকার মত উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশে ছাত্র অসন্তোষ কেন? হতে পারে সে সব দেশের অর্থনীতি কিছুটা স্থিতিশীল, কিন্তু মানুষে মানুষে বৈষম্য, সাদা-কালোর ব্যবধান, ইত্যাকার মানবিক প্রশ্নে সেখানকার ছাত্রসমাজ নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। আগেই বলেছি, মানবতার অবমাননা, সত্য ও ন্যায়ের অপমান অনুভূতিপ্রবণ ছাত্রসমাজের চিত্তে দোলা না দিয়ে পারে না। তাই আমেরিকার মত দেশ যখন ভিয়েতনামের মানুষের স্বাধীনতার নামে পর-ভূমিতে দক্ষযজ্ঞ সৃষ্টি করে নিজ দেশের অসংখ্য সন্তানকে সেই যজ্ঞের হোমানলে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করে, তখন সেখানকার ছাত্রসমাজ এই পরিস্থিতির প্রতি নীরব দর্শক হয়ে থাকতে চায় না। আবার বিশ্বের সেরা সমৃদ্ধশীল দেশ হয়েও মারণাস্ত্রের পিছনে যখন আমেরিকাকে তারা সম্পদের অহেতুক অপচয় করতে দেখে অথবা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনের মত শহরেও যখন বস্তি এলাকার জঘন্য পরিবেশে শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে মানবেতর জীবনযাপন করতে দেখে, তখনও তারা আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। বর্ণ-বৈষম্যের শিকার হয়ে মার্টিন লুথার কিং-এর মত মানবপ্রেমিককে যখন আমেরিকার মাটিতেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তখন সেখানকার সচেতন ছাত্রসমাজ তার সোচ্চার প্রতিবাদ না করে পারে কি? ইংল্যান্ডের ব্যাপারেও সেই একই কথা। যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা নিয়ে সত্যিকার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে সেখানকার ছাত্রসমাজ যখন বলিষ্ঠ

www.pathagar.com

পদক্ষেপে এগিয়ে আসে, তখন তাদের দোষ দেওয়া চলে কি? শিক্ষাদীপ্ত ছাত্রসমাজের এ ভূমিকা তো স্বাভাবিক; এর বিপরীতটাই বরং হত ছাত্রসমাজের স্বভাববিরোধী।

যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বিপুল অর্থ দেশে দেশে ব্যয়িত হচ্ছে, ছাত্রসমাজ বলতে চায় যে, সে অর্থ যদি সেইসব দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত দেশের মানবকল্যাণে নিয়োজিত হত, তাহলে দুনিয়ার চেহারাটাই বদলে যেত। গোলা-বারুদ ও অসংখ্য লোক ক্ষয়ের মাধ্যমে তথাকথিত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আর প্রয়োজন হত না। বরং দেশে দেশে হিংসা-দ্বেষমুক্ত, মানবকল্যাণমুখী সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে বিশ্বশান্তির পথ আপনা-আপনি উন্মুক্ত হত।

ছাত্র আন্দোলনকে 'ছেলেমানুষি' বা মহল বিশেষের 'উস্কানি প্রসূত' বলে যাঁরা উড়িয়ে দিতে চান, আসলে তাঁরা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান। আর এইভাবে পাশ কাটাতে গিয়ে সমস্যাকে তাঁরা আরো জটিল করে তোলেন, যার পরিণতি কেবল ক্ষমতাসীনদের জন্য নয়, সমগ্র জাতির জন্যও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। যে কোন রোগের চিকিৎসার আগে তার যথাযথ ডায়্যাগনোসিস না হলে যেমন সে রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়, ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপারেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সমস্যার সত্যিকার প্রতিকার কাম্য হলে ছাত্র আন্দোলনের মূল কারণ উদঘাটন করাটাই আগে প্রয়োজন। কথায় কথায় গুলি চালিয়ে কয়েকটি তরুণ প্রাণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখানো বা ব্যক্তিবিশেষের অহমিকার তৃপ্তি ঘটানো যেতে পারে, কিন্তু সমস্যার প্রতিকার তাতে হয় না। মৌখিক হিতোপদেশ বা শান্তির ললিত বাণীতেও তখন আর ফলোদয় হয় না। এতে কেবল তিক্ততাই বাড়ছে, যুব সমাজকে হিংস্রতার পথ অবলম্বনেই উস্কানি দেয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশের তরুণ সমাজ যদি জীবনের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হত, তাহলে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেতো কিনা, তা আজ আর বিতর্কের ব্যাপার নয়। সেদিন ক্ষমতার দাপটের পাশাপাশি ছাত্রদের চরিত্রে কলংক লেপনের যে কম কোশেশ করা হয়েছে তা-ও নয়, তবু সত্য চিরঞ্জীব। তাই গুটিকয় কচি প্রাণের তাজা রক্তের বিনিময়ে সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; মিথ্যার হয়েছে পরাজয়। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্রসমাজকে বিগত দশকেও একই ত্যাগ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। জাতির ইতিহাসে তাই সংগ্রামী ছাত্রদের নাম আজ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

এই একই নিয়মে দেশে দেশে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় তরুণরাই দিয়েছে রক্ত; বছরের পর বছর কারাবরণের দুঃসহ অভিশাপ তারা হাসিমুখেই বরণ করেছে। আমাদের দেশের কারাগারও এদেরকে বক্ষে ধারণ করে হয়েছে ধন্য। ছাত্রবন্ধুদের এই যে ত্যাগ, এই যে তিতিক্ষা, এর পিছনে যদি কোন নীতি বা আদর্শ না থাকত, তাহলে এ পথে কিসের মোহে তারা নিজেদের জড়িয়ে চলেছে? যাঁরা মনে করেন, নিছক হট্টগোল কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যই ছাত্ররা আন্দোলনে নামে, তাঁদের জ্ঞানচক্ষু যতশীঘ্র উন্মীলিত হয়, জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

এতকাল ছাত্র আন্দোলনের পিছনে ধিক্কৃত রাজনীতিকদের উস্কানি যাঁরা আবিষ্কার করে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার একটি মাত্র জিজ্ঞাসা–দীর্ঘ বিশ বছরের নির্লিপ্ততা ও জড়তা

www.pathagar.com

কাটিয়ে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সাম্প্রতিক যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার দিশারী কারা? উত্তরে বলতে হবে, গর্ডন কলেজের ছাত্রসমাজ। গর্ডন কলেজের ছাত্র কারা? ক্ষমতাসীন মহলেরই যাঁরা দক্ষিণ বাহু, বাম বাহু, এঁরা কি তাদেরই আদরের দুলাল নয়? তাই যদি হয়, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে? যাঁরা আজ এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, জাতির দুর্দিনে কর্তব্যের তাগিদে তাঁদের সন্তানরাই আজ এগিয়ে এসেছে সংগ্রামের ময়দানে নেতৃত্ব দিতে; নিজ পিতা-মাতার 'ত্রিশঙ্কু' অবস্থা অবধারিত জেনেও এগিয়ে না এসে পারেনি। একেই বলে 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা', একেই বলে নিয়তি।

দেশের যারা 'কর্ণধার' তাঁদের উদ্দেশে তাই বলি, লৌহবর্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে, 'স্ট্রংম্যান' হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে মানুষের কাছে 'মানুষের নেতা' হিসেবে পরিচিত হতে প্রয়াসী হোন। দেখবেন, সব সমস্যার সমাধান আপনার-আমার সকলেরই নাগালের মধ্যে।

তরুণ বন্ধুদের প্রতি আমার আহ্বান, আমি যদি দেশের অবস্থা ও প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভিন্নতর ছবি আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারতাম, তাহলে আমি সর্বাপেক্ষা সুখী বোধ করতাম। দেশবাসীকে পাশ কাটিয়ে দেশের যে সব রাজনৈতিক সংস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এবং তাতে যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে তা গোটা সমাজকে আজ রাহুর মত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাও এর অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। শিক্ষা ব্যবস্থাসহ দেশের গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে এই রাহুর গ্রাস হতে উদ্ধার করতে হলে দেশের যুবশক্তিকেই আজ অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু সেটা কোন রাজনৈতিক দলের বি-টিম হিসেবে নয়। ছাত্র ও যুব সমাজের নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিঃস্বার্থ ভূমিকার ঐতিহ্যকে অমলিন রেখেই তা করতে হবে। আগামী দিনে তোমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে আমি আবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৯৬৮ সালে রাজবাড়ি কলেজ ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ।

www.pathagar.com

গোটা জাতি দায়ী নয়

সারা পাকিস্তানে গত ২৫ মার্চ রাত্র সোয়া নয়টার পর হইতে সামরিক শাসন জারি করা হইয়াছে। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমি এবং উহার লক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সাধারণভাবে সামরিক শাসন ব্যবস্থা কাহারো কাম্য নয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতাতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষত ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে ইহা কেহই ধারণা করে নাই কিন্তু এবারকার সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমিকা অর্থাৎ আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণ এতই বিক্ষুব্ধ ও মারমুখী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না–গত ২১ ফেব্রুয়ারি এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান সত্ত্বেও তাঁহার সরকারের প্রতি কোন অঞ্চলের জনগণেরই আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। বরঞ্চ আইয়ুবের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা 'স্থিতিশীল' সরকারের দুর্বলতা হিসাবেই প্রতিভাত হইয়াছিল। দেশের আইন ও শৃংখলার রক্ষা করা হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল; যাহার ফলে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধী লোক মাথাচাড়া দিয়া উঠিল এবং এখানে-ওখানে অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত হইল। শেষমেষ উপায় অন্তর না দেখিয়াই বিগত ২৫ মার্চ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়াকে দেশ শাসনের ভার গ্রহণের জন্য এক পত্র লিখিলেন। এই অবস্থায় জেনারেল ইয়াহিয়া তথা দেশরক্ষা বাহিনীর পক্ষে ভিন্ন কিছু করার ছিল না। তবে এখন ত্বরিত দেশকে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরাইয়া নিবার উপর জেনারেল ইয়াহিয়া ও দেশরক্ষা বাহিনীর কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে।

অপরপক্ষে সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের সুযোগে সমাজবিরোধী এক অশুভ চক্র মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া সাধারণ নাগরিকদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সচেতন ছাত্রসমাজ এবং রাজনীতিকদের অনেকে এই দুষ্কর্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটি গঠনপূর্বক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন। উত্তেজনা ও উস্কানির মুখে নিজেদের উপর ঝুঁকি লইয়াও আমরা সংশ্লিষ্ট মহলকে বার বার দেশে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার এবং দুষ্কৃতিকারীদের

www.pathagar.com

নিবৃত্ত করার আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সকল সুস্থ মহলের আবেদন সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক অন্যায় আবদার লইয়া ইদানীং যে সব কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছিল এবং রাজনীতির আবরণে একদল উগ্রপন্থী তাহাদেরকে যেভাবে উস্কানি দিতে ছিল তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি নাই। যাঁহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এই সকল অগণতান্ত্রিক ও প্ররোচনামূলক কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইয়া গিয়াছে। এই কার্যকলাপের দরুন দেশের অর্থনীতিতেও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থাও রহস্যজনকভাবে অকস্মাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশ অভাবের দেশ। স্বভাবতই আমাদের গণজীবনও সমস্যায় জর্জরিত, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। বিশেষত শ্রমিক-কৃষক সমস্যা ও বেকারত্ব আজ অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বমূল্যও ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে দেশের দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের সহানুভূতি রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমান গণ-আন্দোলনের সুযোগে কর্মজীবী সর্বস্তরের মানুষ মায় হাজারী দু'হাজারীরাও যেভাবে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি লংঘন করিয়া জ্বালাও-ঘেরাও অভিযানের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সত্যিকারের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং ইহাদের আচরণে ব্যথিত বোধ করিতেছিলাম। বিশেষত বর্তমান ক্ষমতাসীনরা যখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলেন, সেই মুহূর্তে সর্বশ্রেণীর লোকের দাবি-দাওয়া লইয়া রাস্তায় নামিবার যৌক্তিকতা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই; পক্ষান্তরে ক্ষেত্র বিশেষে ইহাকে আমরা প্ররোচনামূলক বলিয়া মনে করিয়াছি। সমগ্র পরিস্থিতি আমাদিগকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য আমাদের মনোভাব দেশবাসীর সম্মুখে সময়মত তুলিয়া ধরিতে আমরা দ্বিধা করি নাই।

আমরা আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিব–দেশের দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর বেতনভোগী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসমূহ পূরণ করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি লাঘবের আশু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের এই মুহূর্তের আবেদন তাহাই। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাহার বেতার ভাষণে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকদের সমস্যার উল্লেখ করিয়া উহা সমাধানে যত্নবান হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আশা করি প্রথম সুযোগেই উহা যথাসম্ভব পূরণ করিয়া দেশের অভাবী মানুষের দুর্দশা লাঘবের পথ তিনি প্রশস্ত করিবেন।

www.pathagar.com

প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় আশ্বাসকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, সামরিক বাহিনী কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে উপরে তুলিয়া ধরিবে না; আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শাসনযন্ত্রকে গতিশীল ও পরিচ্ছন্ন করিবার পরে দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন করা হইবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক যে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠন করা হইবে, সেই পরিষদই দেশের জন্য একটি কার্যোপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধান করিবে। আইয়ুব গোলটেবিল বৈঠকে যে দুইটি দাবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা ইহা উন্নত ধরনের প্রস্তাব বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা, আইয়ুব শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে বাদবাকি বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসা শাসনতন্ত্রের সংশোধনী দ্বারা করিতে হইত এবং উহাতে দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হইত। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ও সেই দিক দিয়া ইহা গণপরিষদের ভূমিকা পালন করিবে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত যে কোন ধারা গৃহীত বা বর্জিত হইতে পারিবে। আমরা আশা করি, দেশে অবিলম্বে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন ত্বরান্বিত করা হইবে এবং দেশে একটি জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই শাসন ব্যবস্থা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। বলাবাহুল্য, যত দ্রুত এই সকল প্রস্তাব কার্যকরী হয়, দেশ-রক্ষাবাহিনীর জন্যও তত মঙ্গলজনক হইবে। মুষ্টিমেয় লোকের উস্কানিমূলক আচরণের জন্য গোটা জাতি দায়ী নয়, এই কথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ না করা, এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত আমাদের জানামতে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ধর পাকড় না করা এবং প্রধান সামরিক শাসকের সংযত ভাষণের ফলে দ্রুত শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

সামরিক শাসনের স্বাভাবিক পরিণতি

প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া গত ২৫ মার্চ রাত্র হইতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি ৩১ মার্চ রাত্রে ঘোষণা করিয়াছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতর হইতে যে প্রেসনোট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ; উহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পর এবং প্রধান সেনাপতিকে ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার (Vacuum) সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রধান সেনাপতি কর্তৃক সামরিক শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাহা পূরণ হইয়াছে। অতঃপর রাষ্ট্রপ্রধানের পদে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ, একটি রাষ্ট্র বিদেশে রাষ্ট্রপ্রধানের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকেই গ্রহণ করিতে হয়। দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর প্রধান সামরিক শাসন পরিচালকের হুকুমনামাতে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পূরণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। এমতাবস্থায় প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার নিজ হস্তে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন গত্যন্তর ছিল না।

প্রেসিডেন্টের পদ পূরণ করার পরে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার অবসান হইলেও আমরা মনে করি আরও অন্যান্য দিকে কতকগুলি ব্যবস্থা জেনারেল ইয়াহিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই সকল ব্যবস্থার ভাল-মন্দের দায়িত্ব একান্তপক্ষে তাঁহারই বিধায় এই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের একার পক্ষে দেশের শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না। তাঁহাকে একটি অস্থায়ী মন্ত্রিসভা অথবা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের মত ১২ কোটি লোক অধ্যুষিত একটি দেশে দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং জরুরি সমস্যাদি সমাধানকল্পে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, এই মুহূর্তে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের কোন উপায় দেখি না। রাজনৈতিক দলসমূহ নিজ নিজ জনপ্রিয়তা ও জনপ্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন ব্যতিরেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তার স্বীকৃত কোন মাপকাঠি নাই। কোন

www.pathagar.com

কোন মহল জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিতে পারেন। কিন্তু আইন সভার অবর্তমানে এবং সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এই ধরনের সরকার গঠন করা হইলে তাহা শাসন ব্যবস্থাকে সবল ও সক্রিয় করিবার পরিবর্তে বরং রশি টানাটানিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনাই বেশি। তাই, আমাদের মতে, এই মুহূর্তে জাতীয় সরকার কিংবা রাজনৈতিক সরকার গঠন না করাই উত্তম হইবে। প্রেসিডেন্টকে উপদেশ প্রদানের জন্য একটি অস্থায়ী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যাইতে পারে। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সুখ্যাতিসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারকদের লইয়া এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন রাজনৈতিক দল হইতে সদস্য গ্রহণ করা হইলে উহা সময়োপযোগী হইবে না বলিয়া নিরপেক্ষ মহলের ধারণা। কোন রাজনীতিকের মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা পরিষদে গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার জনপ্রিয়তা ও জন-প্রতিনিধিত্বের কথা উঠিবেই। রাজনৈতিক পদে জনপ্রিয়তাহীন তথা ধিক্কৃত লোকদের গ্রহণ করিলে গণমনে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, গত দশকের অভিজ্ঞতা হইতে একথা নিশ্চিত বলা চলে। আমাদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ। অবশ্য দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তথাপি আমরা জনমতের খবর রাখি এবং এই সম্পর্কে নয়া রাষ্ট্রপ্রধানকে ওয়াকিফহাল করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করা হইলে সেক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব নির্দলীয় নিরপেক্ষ সুখ্যাতিসম্পন্ন লোককে নিয়োগ করা হইলে ইহা সামরিক শাসকের বিঘোষিত নীতির পরিপূরক হইবে এবং তাহাতে জনসমর্থনও লাভ করা যাইবে।

আলোচ্য সরকারি প্রেসনোট সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হইলে দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হইবে। আমাদের দেশবাসীর গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে। সুতরাং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে দেখিলে তাহাদের মনে হতাশার সৃষ্টি হইবে না; কোন শক্তির পক্ষে তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করা অথবা কোন প্রকার প্ররোচনা দেওয়া সম্ভব হইবে না। আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হইল জনগণের মনে আশা ও আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনা। জেনারেল ইয়াহিয়া এই সকল ব্যাপারে দেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করিবেন, ইহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, ১৯৭০ সালের নির্দিষ্ট সময়ে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে এবং দেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পথে কদম বাড়াইবে। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে জাতীয় সংহতি দৃঢ় হইবে এবং কোন অশুভ কার্যকলাপ জনসমর্থন লাভ করিবে না; বরং দেখা যাইবে যে, দেশের মানুষ তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; রাষ্ট্রীয় সংহতি বিনষ্ট করিতে চায় না। অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনগণ যেমন দৃঢ়চিত্ত, অশুভ শক্তি প্রতিরোধের ব্যাপারেও তাহারা ততখানি সচেতন ও কৃতসংকল্প।

ইত্তেফাক, ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৯

www.pathagar.com

স্তাবকতা প্রসঙ্গে

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের প্রতিকৃতি অফিস-আদালত হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি এখন আর দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নহেন বলিয়াই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি যে এখন প্রেসিডেন্ট বা দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নহেন, তা ঠিক; কিন্তু জনমনের জিজ্ঞাসা হইল, যিনি এক যুগ ধরিয়া এই দেশে দুর্দণ্ড প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন, দশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ যাঁহার ছবি দেশের অফিস-আদালতে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, দোকান-পাটেই নয়, বিগত দশকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়ও দৈনিক ছাপা হইত– কোন কোন পত্র-পত্রিকায় অনেক সময় একই দিনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁহার চার-পাঁচটা ছবি পর্যন্ত ছাপা হইত, যাহা তাঁহার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা-ভালবাসার নিদর্শন ছিল না, তাহা ছিল এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীর স্তাবকতার নিদর্শন। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও প্রমোশন লাভ ইত্যাদি ছিল এই অতিশ্রদ্ধার মূল উদ্দেশ্য। পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশের এই বাড়াবাড়ি আমরা কোনদিন পছন্দ করি নাই।

ব্যক্তিপূজা ইসলামে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, যাহারা ব্যক্তি পূজা করেন বা করিতে বাধ্য হয়, তাহারা শেষ পর্যন্ত স্তাবকে পরিণত হয়। তাহাদের আত্মসম্মানবোধ বা বিবেক বলিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাহাদের স্তাবকতায় তুষ্ট হইয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন, বিভিন্ন উচ্চপদে অবাঞ্ছিত ও অনুপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করিয়াছেন বা আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করিয়াছেন। এই কারণে এই দেশের গণমনে, বিশেষত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মনে আইয়ুব সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন কথা বলার উপায় ছিল না। কোন কিছু বলিতে গেলে স্তাবক এবং অনুগ্রহভোগীরা খড়গহস্ত হইয়া উঠিতেন। স্তাবকদের একজন ঢাকায় দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় রাজধানীর আইয়ুব নগর নামকরণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তখন অবশ্য কেহ কেহ ভয় ও জড়তা কাটাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, কোন জাতীয় বীরের জীবদ্দশায় তাহার নামে শহর-বন্দর, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাটের নামকরণ করা উচিত নয়। এই সেদিনও এই যুক্তিতে আমরা বিরোধী দলীয় কোন কোন নেতার নামে রাস্তা বা পার্কের নামকরণের বিরোধিতা করিয়াছি।

www.pathagar.com

কিন্তু স্তাবক শ্রেণীর লোকেরা কোনদিন যুক্তির ধার ধারে না, ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের মনোবৃত্তি তাহাদের নাই। আমাদের দুর্ভাগা দেশে মুষ্টিমেয় চিহ্নিত স্তাবক যে কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ কেইবা করিবে? অথচ, এদের স্তাবকতার জন্য দেশবাসীকে কত দুঃখ-গ্লানি ভোগ করিত হইয়াছে! জানি না, দেশবাসীর ভাগ্যে আরও কত দুর্গতি আছে। আইয়ুব খান সাহেব ক্ষমতাসীন থাকাকালে যেসব লোককে বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা জানিতেন যে, যোগ্যতার দ্বারা মনিবকে সন্তুষ্ট করার সাধ্য তাহাদের নাই; সুতরাং স্তাবক বা জো-হুজুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। তাই তাহারা স্তাবকতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। ইহার পরিণতি তাহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। দেশের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা স্তাবকতায় এবং প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধবাদীদের দাবাইয়া রাখিতেই তাঁহাদের অধিক সময় ব্যয়িত হইতে থাকে।

যে উন্নয়ন-দশক পালন উপলক্ষে সেইদিনও পাকিস্তানের সিনেমা হল, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাহাত্ম্যে বিশ্বকে তাক লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, বিগত পাঁচ মাসের ঘটনাবলির পর হঠাৎ শোনা গেল যে, দেশের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য, দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত এবং আরও কত কি! অবশ্য সামরিক আইন প্রবর্তনের পূর্বে কল-কারখানায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে, এক কথায় অর্থনীতিতে যে বিস্ময় দেখা দিয়াছিল, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন প্রদান করিতেছি না। কিন্তু আইয়ুব সাহেবের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও যে অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ জনকল্যাণমুখী নয়, তাহাও আজ স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। যেখানে আইয়ুব সরকার পাঁচ মাস পূর্বেও ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের কোন সমস্যা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই, স্তাবকের দল যাহাকে "ধিক্কৃত" রাজনীতিকদের উস্কানি বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, সেখানে বর্তমান শাসকবর্গ শাসনব্যবস্থা গ্রহণকালেই এই তিনটি সমস্যার প্রতি আশু নজর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই সকল সমস্যার প্রতি আইয়ুব সরকারের দৃষ্টি পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করিয়াছি, মুষ্টিমেয় লোকের তেলা মাথায় তেল দেওয়ার পরিবর্তে দেশের মেরুদণ্ড কৃষক, শ্রমিক ও জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের প্রতি নজরদানের আহ্বান জানাইয়াছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও স্তাবকদের সোরগোলে কোন সমস্যাই উচ্চ পর্যায়ে বিবেচিত হইতে পারে নাই। দেশের সম্পদ ও বৈদেশিক ঋণ, সব কিছুর ফায়দা আশে-পাশের ভাগ্যবানরাই লুটিয়াছে। কৃষক তাহাদের সমস্যা নিয়া সংঘবদ্ধভাবে দেন-দরবার করিতে চাহিলে তাহাদের মাথায় ও পিঠে পুলিশের লাঠি পড়িয়াছে; কঠোর অনুশাসনের দাপটে শ্রমিকেরা তাহাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়া দেন-দরবার করিতে গেলে তাহাদের ভাগ্যেও জুটিয়াছে লাঠি-সোটা আর জেল-জুলুম। ছাত্রসমাজের উপরও কী নির্যাতনই না চলিয়াছে! তাহাদের প্রতি শুভানুধ্যায়ী ও অভিভাবকসুলভ সহানুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণের পরিবর্তে যুদ্ধংদেহী মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে বর্তমানে যাঁহারা দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি

www.pathagar.com

আমরা শুধু এইটুকু আবেদন জানাইব যে, তাঁহারা নিজেরা ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিয়া গোটা পরিস্থিতির পর্যালোচনাপূর্বক তাহাদের সমস্যাসমূহের প্রতি কার্যকর অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক ও শ্রমিক-এই শ্রম-শক্তির বদৌলতে পাকিস্তান টিকিয়া আছে। ভারত বিভাগের ফলে যাহারা মনে করিয়াছিল যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়া পাকিস্তান ছয় মাসও টিকিতে পারিবে না, ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছিল আমাদেরই দেশের চাষী ও শ্রমিক ভাইয়েরা। তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ পণ্য দ্বারাই পাকিস্তান স্থিতিশীল বাজেট প্রণয়নে সক্ষম হয়, পাকিস্তান বিশ্বের বুকে সসম্মানে টিকিয়া থাকে।

দেশকে শুধু টিকাইয়া রাখাই নয়, উন্নতির পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও তাহাদের অবদান সর্বাধিক। সরকারি কর্মচারীদের অবদান আমরা তুচ্ছ করিতে চাই না; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে সরকারি অফিস আদালতে যেই শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পূরণ করার ক্ষেত্রে তাহাদের অবদান কম ছিল না। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে তাহাদের অধিকাংশ প্রমোশন রোগে আক্রান্ত হইল। দুই তিন দফা প্রমোশন পাইয়াও তাহারা যেন সন্তুষ্ট নন। সর্বোপরি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অফিসাররা দেশবাসীর, বিশেষত কৃষক-শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে যেন ব্রিটিশ আমলের গণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকারী বনিলেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর এই শ্রেণীর মনোভাব আরও তীব্র হইয়া উঠিল, লাগামহীন ক্ষমতায় তাহাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াইয়া গেল। কৃষক-শ্রমিকদের পরিশ্রমে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে এক শ্রেণীর কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বোধগম্য কারণেই অতি আগ্রহী হইয়া পড়িলেন। তাহাদের 'ট্যাক্স হলিডে' 'বোনাস ভাউচার' কত কিছুর সুযোগ দেওয়া হইতে লাগিল! পক্ষান্তরে দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্গতির কথা তুলিলে বা তাহাদের ঋণদান ও খাজনা মওকুফের সুপারিশ করিলে এই সকল কর্মচারী তাহা সহানুভূতি সহকারে বিচার-বিবেচনা করিবার পরিবর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিতেন। স্বাধীন দেশে আমলাতন্ত্রের যেই দৃষ্টিভঙ্গি দেশবাসী কামনা করেন, সেই কামনা আর পূর্ণ হইল না। আমাদের সর্বাধিক সমস্যা ও সাম্প্রতিক গণজাগরণের মূল কারণও এখানেই নিহিতে। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠান করিলে আমাদের অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন। স্তাবক এবং স্বার্থান্ধ ব্যতীত কেহ এই যুগে কল্পনাও করিতে পারে না যে, দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর সমস্যাকে বাদ দিয়া এবং তাহাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া উপেক্ষা করিয়া সত্যিকার অর্থে দেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

www.pathagar.com

উন্নয়ন দশকের উন্নয়নের শত গুণগান সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশ গরিব দেশ; এখনো মাথাপিছু আয় বিশ্বে সর্বনিম্ন। এমতাবস্থায় বর্তমান শাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে আমরা দেশের বিরাজমান সমস্ত সমস্যার সমাধান আশা করিতে পারি না। তাহাদের হাতে আলাদীনের প্রদীপ নাই। দেশকে ইতোমধ্যেই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণগ্রস্ত করা হইয়াছে। প্রধানত দেশের সম্পদ দ্বারাই দেশ গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই ব্যাপারে বিত্তবানদের এবং সমাজের অন্যান্য সক্ষম মানুষের যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। ভাগ্যবানদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে কে কত টাকা পুঁজি নিয়া এখানে আসিয়াছিলেন এবং এখন তাঁহারা কত টাকা-পয়সা ও কল-কারখানার মালিক বনিয়াছেন। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি এবং সক্ষম ব্যক্তিদের কর পরিশোধ না করার মনোবৃত্তি পরিহার করিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশের শতকরা ৯০ জনকে অভুক্ত-অসন্তুষ্ট রাখিয়া দেশের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। একতরফাভাবে কায়েমী স্বার্থের পায়রবী করাও কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম যাহাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সুবিচার করা প্রয়োজন তাহারা হইল কৃষক, শ্রমিক ও স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীবৃন্দ। আমরা জানি যে, সামরিক বাহিনী-যাহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন–তাহারা দেশরক্ষার কাজেই মূলত নিয়োজিত ছিলেন এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সেই ক্ষেত্রেই রহিয়াছে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাহাদের জানা থাকিবার কথা নয়। এই ব্যাপারে সৎ কর্মচারী, দেশের সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিবে; তবে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের শাসন আমলে যে সকল স্তাবক নিজেদের ভাগ্য গড়িয়াছে এবং দেশবাসীর উপর ডাণ্ডা চালাইয়াছে, যাহারা তাহার পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁহাকে ভুল পথে পরিচালিত করিয়াছে কিংবা অন্যায়, অবৈধ কার্যকলাপে তাঁহার সহায়ক ছিল এবং দেশে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি পূজার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে গরিব রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকার অপচয় করিয়াছে, সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনা স্তব্ধ করিবার জন্য 'ইত্তেফাক'কে প্রায় তিন বৎসর বন্ধ রাখিয়াও যাহারা নিয়তির বিধান হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, সেই শ্রেণীর স্তাবক ও উপদেষ্টাদের আর সযত্নে রাখা হইবে না, বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা এতটুকু প্রত্যাশা করি।

ইত্তেফাক, ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

পরিবর্তিত পরিবেশ

বিগত ৯ এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিয়াছিলাম নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। এরই এক মাস পূর্বে লাহোর ও পিণ্ডি গমন করিয়াছিলাম এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। ১০ মার্চ পিণ্ডিতে দ্বিতীয় দফা গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে এবং তৎপূর্বে লাহোরে 'ডাক' (DAC)-এর অঙ্গদলগুলির বৈঠক বসিবে। এক প্রকার অযাচিতভাবে আমিও নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে ৭ মার্চ লাহোর গমন করি। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইবে; গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গণ-দাবি পূরণের যে আশার আলো দৃষ্টিগোচর হইতেছিল আমি সেই আলোকে আলেয়া মনে করি নাই, বাস্তব বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলাম। ১০ বৎসরাধিক কাল একনায়কত্ববাদী শাসনের আমলে অন্যায়-অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবশেষে এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ জনতা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার যে পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যে পথ প্রশস্ত করার জন্য সর্বস্তরের মানুষ কাতারবন্দী হইয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এক বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি, রাজনৈতিক হটকারিতা অথবা কাহারও ষড়যন্ত্রের ফলে নিষ্ফল হইয়া না যায়, ইহাই ছিল আমাদের সকলের লক্ষ্য। কেননা, এই গণ-অভ্যুত্থান কোন নেতা বিশেষের, দল বিশেষের বা শ্রেণীর বিশেষের একক অবদান নয়। এই অভ্যুত্থানের পিছনে রহিয়াছে শত-সহস্র লোকের বৎসরের পর বৎসর নির্যাতনভোগের কাহিনী। ইহার পিছনে রহিয়াছে লাখো লোকের বঞ্চনা ও নিপীড়ন ভোগ। ইহার পিছনে রহিয়াছে এই দেশের যুবশক্তি, শ্রমশক্তি, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা, অক্লান্ত পরিশ্রম, আর সীমাহীন নির্যাতন ভোগ। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই গোলটেবিল বৈঠকে কাহারও ভুল-ভ্রান্তির জন্য এই সংগ্রাম বৃথা না যায় কিংবা দেশ অন্য কোন বিপাকে না পড়ে, সে-সম্পর্কে অন্যদের মতন আমরাও সতর্ক ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইবার একদিন পূর্বে ঢাকায় ফিরিয়া আমি লিখিয়াছিলাম যে, এইবার পশ্চিম পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় কুচক্রী ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সহানুভূতিশীল মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি, ইতিপূর্বে এমনটি আর লক্ষ করি নাই। পাকিস্তানের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া পূর্ব পাকিস্তানিরা যা যা চায় তাহাই তাহাদের দেওয়া হউক, ইহাই ছিল তাহাদের মনোভাব।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের মধ্যকার কাহারও দোষেই হউক বা আমাদের সকলের দোষেই হউক অথবা ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা দিবার ফলেই হউক, আমাদের দেশের ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াও পরাজিত হইয়াছি। ইহা সাময়িক ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু এই পরাজয়কে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার দায়িত্ব যদি একমাত্র প্রতিপক্ষের উপর চাপানো হয়, তাহা হইলে ইহা আত্মপ্রবঞ্চনারই শামিল হইবে এবং জনগণকে ধোঁকা দেওয়া হইবে। গভীর পরিতাপের বিষয় হইলেও এই পরাজয়কে স্বীকার করিয়া নিয়া আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এই দেশে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি নতুন কিছু নয়। একটি ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থবাদী মহল লোভ দেখাইয়া কিভাবে গণঐক্যে বার বার ফাটল ধরাইয়া গণ-দাবিকে ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে, নিরাসক্তভাবে সেই অতীতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। জনগণের নামে আমরা সবাই মূর্ছা গেলেও আমাদের লোকেরাই নেতৃত্বের মোহে বা দলীয় স্বার্থে বার বার জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করিতেও দ্বিধা করেন নাই। শুধু তাই নয়, তাহারা জনগণের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিবার জন্য অলীক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, জনদরদের ভান করিয়াছেন নানান উদ্দেশ্যে। কেহবা নিজের অপারগতা, অকর্মণ্যতা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে, আবার কেহবা গোপন হস্তের ইঙ্গিতে। সময় ও সুযোগ মিলিলে গণ-সংগ্রামের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে যাহারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা বোকার মতন পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে আমরা দ্বিধা করিব না। কেননা, যে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে এই দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এক বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছিল, যে সংগ্রামের ফলে গণ-দাবি প্রতিষ্ঠা অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সংগ্রামে এই দেশের সাধারণ ছাত্র, সাধারণ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সচেতনতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আইয়ুব শাসনামলে জনগণের হাত হইতে যে অস্ত্র কাড়িয়া নিয়া গোটা দেশবাসীকে পঙ্গু ও নাগরিকত্বহীন করিয়া ফেলা হইয়াছিল, জনগণ সেই মোক্ষম অস্ত্র (অর্থাৎ ভোটাধিকার সার্বভৌমত্ব) হাতের মধ্যে পাইয়াও পাইল না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। এই জন্য অন্য কাহাকেও দোষারোপ করিবার পূর্বে আমরা কে কোথায় কি করিয়াছি, তাহার পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। দেশ জাগিয়াছে; দেশবাসীর অধিকারকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবে না, সেই সম্পর্কে আমরা আজও দৃঢ় আশাবাদী। কিন্তু যাহারা দেশবাসীর অতি দরদী সাজিয়া দেশবাসীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছেন, দেশকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এখনই সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা না হইলে ভবিষ্যতেও তাহারা

www.pathagar.com

একইভাবে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে এখন এমন কোন জনপ্রিয় নেতা নাই, যিনি এককভাবে গোটা দেশের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা রাখেন। ইহা গণতন্ত্রেরও পরিপূরক নয়। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় সহনশীলতা ও সম-মতাবলম্বীদের যৌথ নেতৃত্বই অধিকতর কার্যকরী। ভাবপ্রবণতা, রাজনৈতিক অসাধুতা এবং রাজনীতিতে ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তি পূজা আমাদিগকে পরিহার করিতেই হইবে। তাহা হইলেই দেশে সুষ্ঠু রাজনীতি ও গঠনমূলক চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিবে। একমাত্র সেই অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে এবং স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

বলা বাহুল্য, একমাস আগেকার পরিবেশ এবং এবারকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কারণও বোধগম্য। তবে নয়া প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব কাথাবার্তা বলিয়াছেন এবং প্রশ্নোত্তরকালে সকল প্রশ্নের সহজভাবে তিনি যে স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন, তাহা প্রথম সামরিক শাসন আমলের আচরণ হইতে ভিন্ন। অবশ্য আমাদের দেশে কথা ও কাজের মধ্যে অনেক সময় সঙ্গতি থাকে না বলিয়াই মানুষ ভালো কথার সাথে সাথে ভালো কাজও চায়। এই ক্ষেত্রেও জেনারেল ইয়াহিয়ার শাসনব্যবস্থায় পূর্বেকার আমল হইতে এখন অনেকটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আমরা লক্ষ করিয়াছি। দেশবাসীও লক্ষ করিয়াছে, এই শাসনব্যবস্থাধীনে পূর্বেকার মতন রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই; রাজনীতিকদের ধর-পাকড়ও করা হয় নাই। রাজনৈতিক তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইলেও তাহাদের পরস্পর মেলামেশায়ও কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় নাই। রাজনীতিকদের উঠিতে-বসিতে গালাগালি করার যে বদঅভ্যাস আইয়ূব আমলের বৈশিষ্ট্য ছিল, এই ক্ষেত্রে তাহাও অনুপস্থিত। এমনকি প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং আঞ্চলিক সামরিক শাসকদের ওপর গভর্নরের দায়িত্বভার অর্পণ যে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা দূরীকরণ এবং সাময়িক ব্যবস্থামাত্র, গণমনে সেই ধারণার সৃষ্টি করিতেও তাঁহারা দ্বিধা করেন নাই। এগুলিকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে শুভ লক্ষণ বলিয়াই গণ্য করিব।

বর্তমান শাসনব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইল প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতি-মুক্ত করিয়া উহাকে কার্যক্ষম ও গতিশীল করিয়া তোলা। জেনারেল ইয়াহিয়া ও তাঁহার সহকর্মীরা মনে করেন যে, দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার ইহা পূর্বশর্ত; এই সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শুদ্ধিকার্য পরিচালনার সাথে সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রাথমিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতেও কোন বাধা নাই বলিয়া আমরা মনে করি। বরং শাসনযন্ত্র হইতে

www.pathagar.com

দুর্নীতি দূরীকরণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি গৃহীত হইলে জনগণের মনে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার যে আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে তাহাতে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষে জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা লাভ সহজ হইবে। বলাবাহুল্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২১ বৎসরের মধ্যেও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে একবারও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্বে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা জনগণের নিকট বার বার কথা দিয়াছেন, কিন্তু তাহা পালন করেন নাই, বরং বিপরীত কাজ করিয়াছেন। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ূবের এক যুগের স্বৈরাচারী শাসন দেশবাসীর সকল আশা-ভরসা এবং অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছে। এই অনাস্থাজনিত পরিস্থিতির জন্য দেশের উভয়াঞ্চলে অভাবিতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। অনিয়ন্ত্রিত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে এখানে-ওখানে উস্কানিদাতাদের কারসাজির ফলে আইন-শৃঙ্খলাও ব্যাহত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জনগণের অনুভূতি ও এই গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকা আমাদের কাহারও বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

জেনারেল ইয়াহিয়া দেশের আশু সমস্যাবলির প্রতি নজর দিয়াছেন। শুধু পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা, ছাত্রদের সমস্যা এবং শ্রমিক-কৃষকদের সমস্যা অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে এবং লাভ করিবার যোগ্যও বটে। কিন্তু এই সকল সমস্যার সাময়িক সমাধান এক কথা আর স্থায়ী সমাধান অন্য কথা। যে কোন শাসন ব্যবস্থার সহিত জনগণকে পূর্ণ অংশীদার করা না হইলে কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। আমাদের ধারণা, বর্তমান শাসকমণ্ডলী সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই আমরা আশা করিব, প্রশাসনিক যন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত ও গতিশীল করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি অর্থাৎ ভোটারলিস্ট তৈরি, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ শুরু করা হইবে। কোন্ শাসনতান্ত্রিক ভিত্তিতে ইহা করা উচিত, সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিব।

ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রনায়ক

শহীদ সাহেব চিরনিদ্রায় শায়িত। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ-নির্দেশ গ্রহণের সুযোগ আর আমাদের রহিল না। তবে শহীদ সাহেবের চিন্তাধারা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এক কথায় তাঁহার জীবনদর্শন আমাদের সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। তাঁহার রাজনৈতিক মতাদর্শে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। তিনি যাহা চিন্তা করিতেন বা যাহা কামনা করিতেন, তাহা নির্ভয়ে এবং অকপটে ব্যক্ত করিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল। তাই তাঁহার নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটিলেও তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তাঁহার অগণিত ভক্ত ও অনুসারীদের মতন তাঁহার লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে আমারও সম্যক জ্ঞান আছে। তবে এই ক্ষেত্রে আমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গত চার বৎসর যাবত তিনি আমার মতন একজন সামান্য কর্মী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সহিত অবস্থান করিয়া আমাকে যেভাবে ধন্য করিয়াছেন, তারই সুযোগে আমি যতখানি নিকট হইতে মানুষ শহীদকে দেখিতে পাইয়াছি, ততখানি সুযোগ অনেকের ভাগ্যেই হয় নাই। মহান নেতার সহিত এই ব্যক্তিগত সান্নিধ্য শুধু আমার জীবনে ও আমার দৃষ্টিভঙ্গিতেই এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে নাই, ইহার ফলে শহীদ-চরিত্রের বিভিন্ন দিক সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগও আমি লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সান্নিধ্য লাভ আমার জীবনে এক অক্ষয় সঞ্চয় হইয়া রহিয়াছে।

১৯৪২ সালে শহীদ সাহেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁহার অপূর্ব কর্মশক্তি ও চারিত্রিক গুণাবলি সেইদিন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেইদিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাহাকে ছাড়া অন্যকোন নেতার জীবনাদর্শ অনুসরণ করার কথা চিন্তাও করিতে পারি নাই।

শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরিয়াই তাঁহাকে জীবনের অধিক পথ পাড়ি দিতে হইয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ষোল বৎসরে মাত্র তের মাস ছাড়া বাকি সময় তিনি বিরোধী দলে ছিলেন; আর তাহা সাধারণ অর্থেই বিরোধী দল নয়। তাঁহাকে বাধা দেওয়ার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করা হইয়াছে তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়। শহীদ সাহেবের এই ধরনের দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক জীবন সত্ত্বেও আমরা – তাঁহার ভক্ত অনুসারীরা-কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করিতে পারি নাই। তাঁহার আদর্শ আর চারিত্রিক গুণাবলি আমাদিগকে এমনিভাবে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

www.pathagar.com

শহীদ সাহেব সম্বন্ধে আজ আমাকে কিছু লিখিতে হইলে এত কথা মনে পড়িয়া যায় যে, কোন্ কথা ফেলিয়া কোন্ কথা লিখিব তাহা নির্ধারণ করিতে পারি না, তবে ইচ্ছা আছে যে, তাঁহার কর্মময় জীবনের যেটুকু আমি দেখিয়াছি, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে আমি ভবিষ্যতে লিখিব।

শহীদ সাহেবের মৃত্যুশোকে আজ সমগ্র দেশবাসী শোকাভিভূত। আমি ঘরে ঢুকিলেই তাঁহার কথাগুলো আমার কানে বাজে; চক্ষু মুদিলেই তাঁহার মুখখানা আমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ-ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে আবেগ-প্রবণ করিয়া তোলে। এই অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে লেখার মত মানসিক অবস্থা আমার নাই। তবু আমি জানি, আজ গোটা দেশবাসীর মুখে শহীদ সাহেবের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা নাই। শহীদ সাহেবের অবর্তমানে জাতির ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাই নিয়াই যখন আজ সর্বত্র আলোচনা, তখন তাঁহারই একজন নিকটতম অনুসারী হিসেবে আমার পক্ষে একেবারে চুপ থাকা উচিত নয়।

শহীদ সাহেবের মৃত্যুর কথা স্মরণ হইলেই এক দিকে মনে পড়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদানের কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহারই সৃষ্ট পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষীরা কিভাবে তাঁহাকে অপমান-অপদস্থ করিয়াছে, কিভাবে তাহারা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপবাদ ছড়াইয়াছে; এমনকি তাঁহার দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছে। পাকিস্তান আন্দোলনকালে কখনও আমরা চিন্তা করিতে পারি নাই যে, যে নায়কের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই পাকিস্তানে তাঁহাকে অহরহ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতন কলঙ্ক-জনক অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইবে। ভাবিতে পারি নাই যে, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র তাঁহাকে রাজনীতি হইতে ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ভাবিতে পারি নাই, পাকিস্তান সংগ্রামের প্রধান সিপাহসালার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ৭০ বৎসর বয়সে পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ভাবিতে পারি নাই, কারাগারের সেই নিঃসঙ্গ জীবনে একটি ময়না পাখি এবং জেলের একজন 'ফালতু' তাঁহার একমাত্র সঙ্গী থাকিবে। মানুষ যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, পাকিস্তানে তাহাই সম্ভব হইয়াছে। কিভাবে তিনি জেলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন তাহা সচক্ষে অবলোকন করিবার দুর্ভাগ্য আমার হইয়াছিল। জেলে থাকাকালেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শহীদ সাহেব অবশ্য আমাদের তাহা বুঝিতে দেন নাই, আর আমরাও তাহা বুঝিতে চাই নাই। আমরা চাহিয়াছিলাম, তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিন। তিনি জানিতেন, দেশবাসীও তাহাই চায়। তাই তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কথা কিংবা হৃদরোগের কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। কিন্তু গতকল্য (৯-১২-৬৩) আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম শহীদ সাহেব তাহাকে একদিন তাঁহার ফুলা পা টিপিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, জেলে থাকার দরুন তাঁহার স্বাস্থ্যের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করেন নাই, যে ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কাল বিরোধী দলে থাকিয়া রাজনীতি করিলেও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কোন কটূক্তি করেন নাই, যে ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়াতো দূরের কথা সেইরূপ চিন্তাও কখনো করেন নাই, এহেন ব্যক্তির প্রতি এই হীন আচরণের হেতু আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়ঙ্গম করা মুশকিল হইলেও এই আচরণের কারণ দেশবাসীর অজানা নাই।

www.pathagar.com

শহীদ সাহেবকে আর আমরা আমাদের মাঝে ফিরিয়া পাইব না। মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে বহু দেশপ্রেমিক মনীষীর অপমান ও নির্যাতন ভোগের কাহিনী অবশ্য বিরল নয়, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা শুধু ব্যক্তিবিশেষেরই সর্বনাশ করে না, গোটা জাতিরও সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। শহীদ সাহেবের মৃত্যুবরণের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতার অবসান হইলে তাঁহার নির্যাতন ভোগ সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা গণ্য করিব। তাঁহার মৃত্যু আমাদের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া গিয়াছে যে, যাঁহারা অকৃত্রিমভাবে মানুষকে ভালবাসেন এবং মানুষের কল্যাণে সংগ্রাম করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শত প্রচারেও মানুষ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় না। শহীদ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রচারের পর প্রদেশবাসী বিশেষত ঢাকায় তাঁহার মৃতদেহ পৌঁছার পর যে দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি, তাহাতে প্রিয় নেতার প্রতি জনতার অকৃত্রিম দরদ বিমানবন্দর হইতে রেসকোর্সের বিপুল জনসমাগমে প্রমাণিত হইয়াছে। শহীদ সাহেব এদেশের মানুষের মনের গভীরে যে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার অভিব্যক্তি ঘটিল। মৃত্যুর পর শহীদ সাহেব আর একবার এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন যে, জনগণের সহিত যে নেতার হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, সেই নেতা অমর।

মানুষ মরণশীল; শহীদ সাহেবও এর ব্যতিক্রম নন, কিন্তু জাতির যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁহার মৃত্যু যে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিল ইহাও সত্য। তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাঁহার নিজের দিক দিয়া তিনি যথা-সময়েই মরিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রনায়ক। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়াও তিনি জাতির প্রতিনিধির কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বিদেশ গমনের পর এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হইল, তাহা তাঁহাকে কিভাবে ব্যথিত করিয়াছিল, তাঁহার লিখিত বিভিন্ন পত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষের উপর এইরূপ নির্ভরশীলতা তিনি শুধু অপছন্দই করেন নাই, ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধও হইয়াছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়া তিনি যে আর দেশের কাজে লাগিবেন না এই ধারণা তাঁহাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর অপরদিকে গণতন্ত্রের দুশমনেরা দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে কি ধরনের জঘন্য কুৎসা রটনা করিতেছিল তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। লাহোর হইতে প্রকাশিত প্রেসের নাম-ধামহীন এক প্রচার পত্রে কুৎসা রটানো হইয়াছিল যে, শহীদ সাহেব বৈরুতে এক মার্কিন পরিবারের সহিত অবস্থান করিতেছেন এবং মার্কিন সরকার তাঁহার সকল খরচপত্র বহন করিতেছেন। তিনি সাম্প্রতিক আমার নিকট এক পত্রে এই তথ্য প্রকাশ করিয়া সখেদে লিখিয়াছিলেন, 'এরা আমাকে কি মনে করে যে, আমি আমার জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য বিদেশীদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিব?' তিনি আরো লিখিয়াছিলেন, 'সবাই জানে যে, আমার জামাতা ধারকর্জ করিয়া আমার জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা চিকিৎসা ইত্যাদি খরচ বাবদ পাঠাইতেছে, তবু আমার বিরুদ্ধে এই প্রচারণা কেন?'আমি পত্রখানা পাঠ করিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম যে, এই প্রচার-পত্র খানার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে কতখানি আঘাত লাগিয়াছিল। শহীদ সাহেব বিত্তশালী ছিলেন না সত্য; কিন্তু তিনি যখন ঠিকভাবে আইন ব্যবসা করিতেন তখন মাসিক অন্তত ৪০/৫০ হাজার টাকা উপার্জন করিতেন। আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষী। অবশ্য তাঁহার নিকট টাকার কোন মূল্য ছিল না, তাও আমি জানিতাম। এক

www.pathagar.com

হাতে টাকা উপার্জন করিতেন আর অন্য হাতে সব টাকা বিলাইয়া দিতেন। বস্তুতপক্ষে শহীদ সাহেবের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে তাঁহার জামাতার নিকট হইতে আমি এই মর্মে একখানা চিঠি পাই যে, তাঁহার জুরীখে অস্ত্রোপচার ইত্যাদির জন্য পনের হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে এবং এই সম্পর্কে আমরা কিছু করিতে পারি কি-না তাহা তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি যথা-সময় তাঁহার পত্রের জবাবও দিয়াছিলাম এবং শহীদ সাহেবের নিকট পনের হাজার টাকা প্রেরণের জন্য তাঁহার জামাতা স্টেট ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণও করিয়াছিলেন। জানি না, স্বার্থান্বেষীরা শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের যে কুৎসা রটনা করিয়াছিল তাহাই তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের উপর শেষ আঘাত হানিয়াছিল কি না। জানি না, আল্লাহ কিভাবে এই অপপ্রাচারকারীদের বিচার করিবেন। তবে আমাদের সকলের প্রধান সান্ত্বনা, যে দেশবাসীর জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা কোন কুৎসায় বিভ্রান্ত হয় নাই। মৃত্যুর পরে গোটা দেশ যেভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে, ইহা তাহারই সাক্ষ্য। দেশের মানুষ প্রমাণ করিল যে, যাহারা সত্যিকারভাবে তাঁহাদের জন্য দরদী মন নিয়া সংগ্রাম করেন, দেশবাসী তাঁহাদের ভোলে না। তাই যে লক্ষ্য ও আদর্শের সংগ্রামে শহীদ সাহেব নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহাকে আমরা কতখানি আগাইয়া নিতে পারি তার উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। আমরা তাঁহাকে সত্যিকারভাবে কতখানি শ্রদ্ধা করিতাম ও ভালোবাসিতাম, তারও প্রমাণ মিলিবে ইহারই মধ্যে। তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্যের উপর দেশবাসীর কতখানি সমর্থন ছিল, শোক প্রকাশের মাধ্যমে জাতি তাহার প্রমাণ দিয়াছে। তাই তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং জাতিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে অধিকতর সক্রিয় হইতে হইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধন। তাঁহার মৃত্যুর পর আজ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাসে নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করিতে হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান সমমর্যাদার অধিকারী; দেশ গঠনের নামে মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করিয়া রাখার আর অবকাশ নাই। ইহা ভাঁওতাবাজি। সত্যিকারভাবে দেশ গঠন করিতে হইলে মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করিয়া রাখা, সত্যিকার গণতন্ত্রের বিকাশ হিসাবে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রচারণা, কিংবা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রয়োজন করে না। একমাত্র কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই মানুষকে এবং জনতার মুখপত্র ও মুখপাত্রদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়। শহীদ সাহেব নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের পথেই এই দেশ বাঁচিতে পারে। তাই মানুষের প্রতি শঠতা ও চতুরতার পথ পরিহার করিয়া সহজ-সরল পথ গ্রহণ করা না হইলে এই দেশের ভবিষ্যৎ বিশেষ করিয়া জাতীয় সংহতি যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, শহীদ সাহেবের মহাপ্রয়াণের পটভূমিকায় আমরা আজ সেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই।

ইত্তেফাক, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩।

www.pathagar.com

ইতিহাসের মতন গতিশীল জীবনের দুটি অধ্যায়

কাছের মানুষ কোনদিন মহামানুষ হয়ে উঠেন কি-না আমি জানি না; কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আমার কাছে কাছের মানুষ আর মহামানুষ দুই-ই। তাই আজ তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে বার বার আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছে; আর মনে পড়ছে তাঁর অন্তিম সময়ে লেখা একটি চিঠির কথা, 'যদি আর কারো কাজে না আসি, যদি আর মানুষের সেবায় না লাগতে পারি, তা'হলে বেঁচে থেকে লাভ কি?' সত্যি, তিনি আর বাঁচেন নি! জীবনভর যিনি দেশের সেবা করেছেন, দেশের মানুষের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, সংগ্রাম শেষে তিনি বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। আমাদের দুঃখ, প্রবাসে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল; স্বদেশের আলো আর স্বজনের স্পর্শ তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তকে শান্তি কিংবা সান্ত্বনায় আপ্লুত করেনি। দেশবাসীর শোকাশ্রুভেজা পথে তাই মহানায়কের অন্তিম যাত্রা-পথ তৈরি হয়েছিল। দেশব্যাপী সেই শোকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শোক ভুলে গেছি।

আগেই বলেছি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আমার কাছে কাছের মানুষ আর মহামানুষ দুই-ই। তাই কিভাবে আমি তাঁকে আপনাদের কাছে চিত্রিত করবো বুঝে উঠতে পারছি না। যদি কাছের মানুষ হিসেবে চিত্রিত করতে যাই, তা'হলে বলতে হবে, তিনি কাছে থেকেও ছিলেন অনেক দূরে। একই মানুষের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের এমন প্রকাশ ও স্ফুরণের নজির আমাদের সমকালীন রাজনীতির ইতিহাসে আর আছে কি-না সন্দেহ। স্নেহ ও মমতায় কোমল মানুষটিকে দেখে যখন ভেবেছি, তাঁকে ঠিক চিনেছি, তখনই আবার দেখেছি তিনি রুদ্র ও কঠোর। কোন একটা সমস্যায় আমাদের সকল যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে যখন ভেবেছি, তাঁর আর পাল্টা কথা বলার পথ রাখিনি, তখন দেখেছি মাত্র একটি শাণিত যুক্তিতে তিনি আমাদের- শুধু আমাদের কেন- অনেক বড় বড় কূটবুদ্ধি নেতার সকল যুক্তি-বুদ্ধি উড়িয়ে দিয়েছেন।

যে পথ আপাত ভালো ও আপাত সহজ, সে পথে তিনি কখনো পা দেননি। আমরা ভেবেছি তিনি ভুল করছেন; কিন্তু পরে দেখেছি, যে-পথ আমাদের কাছে বক্র ও বন্ধুর মনে হয়েছিল, সে পথই আমাদের উত্তরণের পথ। গ্লাডস্টোনের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বের তুলনা করলে আপনারা বিস্মিত হবেন কি-না জানি না, কিন্তু বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্মৃতিকথা পড়ে সম্প্রতি আমার মনে হয়েছে, সত্যি, এ দু'নেতার ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য বড় কৌতূহলোদ্দীপক। রাসেল তাঁর শৈশব স্মৃতিতে লিখেছেন, গ্লাডস্টোন ছিলেন আশ্চর্য রাশভারী মানুষ। বিরোধী দলের নেতারাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে দ্বিধা করতেন। একদিন রাসেলদের বাড়িতে গ্লোডস্টোনের নৈশভোজের দাওয়াত।

www.pathagar.com

রাসেলের দাদী ছিলেন গ্লাডস্টোনের আইরিশ নীতির পুরোপুরি বিরোধী। গ্লাডস্টোন ভোজসভায় আসার আগে তিনি সকলকে বললেন, 'আগে প্রধানমন্ত্রী আসুন, তারপর দেখবেন, আমি কেমন করে তাঁর আইরিশ নীতির বিরুদ্ধে কড়া কথা শুনিয়ে দি।' কিশোর রাসেল এ বাকযুদ্ধ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, সেই বহু প্রত্যাশিত বাকযুদ্ধ আর হলো না। বরং রাসেল বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর দাদীও আগ্রহে গ্লাডস্টোনের সব কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা আমি বহু দেখেছি। তাঁর সব কথায় সব লোক একমত হতেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর সামনে গেলে সবাই যেন মন্ত্রবলে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। শুধু কি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ? অস্ত্রধারী শত্রুও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বের সামনে যেন নিশ্চল পাথর হয়ে যেত। ১৯৪৬ সালের সেই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দী কখনো একজন রক্ষী নিয়ে, কখনোবা একা কলকাতার অলিগলিতে বিপন্নকে রক্ষার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সেনানী। তাঁর মাথার উপর দুর্বৃত্তের ছোরা উদ্যত; কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী অকুতোভয়। নিরস্ত্র জননেতাকে দেখে সশস্ত্র গুণ্ডারা পালিয়ে গেছে; তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করার সাহস করেনি। এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে নেতা, তাঁকে এককালের প্রখর শক্তিশালী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের সঙ্গে তুলনা করলে কি অসমীচীন হবে? আমার তো মনে হয়, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব গ্লাডস্টোনের চেয়েও বেশি বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক ছিল। কিন্তু এ বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন নিজের চরিত্রের বিস্ময়কর সৃজনী ক্ষমতার মধ্যে। জনচিত্তে তিনি ছিলেন আশ্চর্য যাদুকর। জনসাধারণের নেতা বলতে যা বোঝায়, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তা-ই। জনসাধারণের সঙ্গে জনসাধারণের একজন হয়ে মিশবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ফলে, জনসাধারণই ছিল তাঁর সকল প্রেরণা, কর্মোদ্যোগ ও শক্তির উৎস। জনসমুদ্র থেকে যে প্রাণবন্যার গতিবেগ তাঁর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই-ই তাঁকে করে তুলেছিল অদম্য, অকুতোভয় এবং বিচিত্র ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

কত বিচিত্র ভূমিকায়ই না আমরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছি। কখনো শ্রমিক নেতা, কখনো কৃষক নেতা, কখনো মধ্যবিত্তের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নির্ভীক সারথী, কখনো দেশের মুক্তি আন্দোলনের সেনানী, স্বাধীন স্বদেশে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের জন্মদাতা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের কারালাঞ্ছিত নেতা। সর্বোপরি দেশবরেণ্য, জনগণনন্দিত জাতীয় নেতা। ইতিহাসের এ দূরের ও কাছের অধ্যায়গুলো যখন আমার মনে পড়ে, তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের কোন তুলনা আমি খুঁজে পাই না। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও কর্মকাণ্ড আমার কাছে এক ইতিহাস। এ ইতিহাসের সব অধ্যায়ের উন্মোচন ও বিশ্লেষণ আমার সাধ্যাতীত। তাই ভাবীকালের কোন জীবনীকার বা ঐতিহাসিকের জন্য সে দায়িত্ব পালনের ভার রেখে আমি

www.pathagar.com

আপনাদের কাছে তাঁর চরিত্রের মাত্র দু'টো দিকের কথাই আজ তুলে ধরতে চাই। আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগকে বলা চলে গণতান্ত্রিক আদর্শের এক মহাপরীক্ষার যুগ। গণতন্ত্রকে বহু যুগ ধরে Trial and error-এর মধ্য দিয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুতে হয়েছে। কিন্তু এ যুগে গণতন্ত্রের জন্য যে সঙ্কট ও পরীক্ষার সূচনা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অভাবিত। স্বেচ্ছাচার বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতীতে গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে; কিন্তু এ 'নিও-ফ্যাসিজমের' যুগে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিতন্ত্র বা সমূহতন্ত্র যখন প্রকৃত গণতন্ত্রের উপর মৃত্যুখড়্গ ঝুলিয়েছে, তখন রাজনৈতিক আদর্শ বা রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে নির্ভেজাল গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সত্যই দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনোপলি অর্থনীতি ও ব্যক্তিতন্ত্রকে যখন গণতন্ত্রের মুখোশ পরানো হয়, কিংবা অর্থনৈতিক প্রগতিবাদকে যখন গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তখন প্রকৃত গণতন্ত্রের কথা বলা অনেকটা সেকেলে ও উপহাসের মত শোনাতে পারে বৈকি। কিন্তু আজ একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতন্ত্র এবং একমাত্র গণতন্ত্র ব্যতীত জনসাধারণের ইচ্ছার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার অন্য কোন বিকল্প উদ্ভাবিত হয়নি। হোসেব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এ গণতন্ত্রেরই অতন্দ্র সাধক। তাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছিলেন-"কোন ব্যক্তির খেয়ালের উপর নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে। গণতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন; কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই তৈরি। এর অপরিহার্য ত্রুটি আছে, কিন্তু মোটের উপর গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রগতি ও বিবর্তনের একমাত্র নিশ্চিত পথ। একে শুধু সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই দিতে হবে না, বরং একে এ রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, নির্ভুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।" এ উক্তি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে একটি আপ্তবাক্য ছিল না, ছিল নির্ভুল জীবন-দর্শন। তাই সাবেক বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে মাত্র তের মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁকে যে নীতি অনুসরণ করতে দেখা গেছে, তা'হল গণতন্ত্রের নীতি। বৃটিশ শাসনামলে সাবেক বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের পরক্ষণে প্রথম সুযোগেই তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করেছিলেন। শুধু রাজবন্দীদের মুক্তিদান নয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে ভারত রক্ষা বিধানে কোন রাজনীতিককে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপেও তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি। জাতির উদ্দেশে প্রথম বেতার ভাষণেই তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকেই তাদের বক্তব্য বলার এবং জাতির সেবার উদ্দেশ্যে তারা যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তা' জনগণের সামনে পেশ করার সুযোগ দিতে হবে। আমি আশা করি যে, প্রচারণার সময় প্রত্যেকেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবেন, যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করবেন, যথার্থ সমালোচনা করবেন, গঠনমূলক

www.pathagar.com

প্রস্তাবটি পেশ করবেন এবং অশোভন নিন্দাবাদ পরিহার করে চলবেন। জনসাধারণ কি করবেন, তা' জনসাধারণই স্থির করবেন।" অথচ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে তিনি যে ব্যবহার পেয়েছিলেন, তা' মোটেই গণতান্ত্রিক তো নয়ই, এমনকি শোভনও নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এমন কোন অস্ত্র নেই, যা তাঁর বিরদ্ধে প্রয়োগ করেন নি; এমন কোন নিন্দাবাদ নেই, যা তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়নি। পাকিস্তানের আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সেনানী তাঁর প্রথম সফরে এসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, গণ-পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল; এমনকি দেশের বিভিন্ন অংশেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু হাসিমুখেই তিনি সব সহ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি পাল্টা আঘাত হানেন নি। পদের প্রলোভন যেমন তাঁকে প্রলুব্ধ করেনি তেমনি ক্ষমতাসীনদের ভ্রুকুটিও তাঁকে বিচলিত করেনি।

দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন; আর তাই তাঁর কণ্ঠেই নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার কথা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। মহাপরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের সব ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে নিজ নেতৃত্বেই তিনি পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বিরোধীদল গঠন করেন। এ কাজে সব রকমের ক্লেশ তিনি সহ্য করেছেন। যেমন বিরোধীদলের নেতা থাকাকালে, তেমনি ক্ষমতায় থাকাকালেও গণতন্ত্রই ছিল জনাব সোহরাওয়ার্দীর অভীষ্ট লক্ষ্য। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই কেবল তাঁরই উদ্যোগে আর তাঁরই নেতৃত্বে দেশে সেদিন সুষ্ঠু বিরোধী দলের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ৮০ জন সদস্যের জাতীয় পরিষদে মাত্র ১৩ জন দলীয় সদস্য নিয়ে তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার নেতা হয়েছিলেন। তাই নিরাপত্তা আইন বা বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রদ করতে না পারলেও তাঁর সরকারের আমলে কারো উপর নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়নি বা কাউকে বিনা বিচারে আটক করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দল আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তদানীন্তন আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, নিরাপত্তা আইনের স্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটিয়েছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে যিনি বা যে দল শাসনকার্য পরিচালনা করতে চান, তাঁদের জন্য ক্ষমতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন অপ্রয়োজনীয়, তেমনি অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতার নীতি। জনাব সোহরাওয়ার্দী একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর বহু বক্তৃতা-বিবৃতিতেই স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্রই হলো আমার একমাত্র ভরসা।' প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকায় আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে আবেগময় ভাষায় তিনি ক'টি কথা বলেছিলেন তা' আজো আমার কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন ঃ "ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। ষড়যন্ত্র করা কাকে বলে আমি তা' জানি না। আল্লাহ আমাকে এমনভাবে কাজ করে যাওয়ার তওফিক দিন, যেন আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমন লোক

www.pathagar.com

ছিলেন, যিনি বিনা ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং বিনা ষড়যন্ত্রেই দেশসেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।" তাঁর সে কথার এখানেই শেষ নয়। রাজনীতিতে জনগণের কি ভূমিকা তারও ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন ঃ "আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রতিটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ফয়সালাই আমার কাম্য। রাজনীতির ব্যাপারে আদালতের বিচারে আমি বিশ্বাসী নই। রাজনীতির ক্ষেত্রে কেউ কোন অপরাধ করে থাকলে জনগণের আদালতেই তার বিচার হবে। তাই এব্যাপারে কাউকে আমি আদালতে আসামির কাঠগড়ায় হাজির করে সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা করতে রাজি নই। আমার অতি বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকেও আমি আদালতে প্রেরণের চেয়ে জনগণের আদালতে প্রেরণই সবচেয়ে ভালো সমাধান বলে মনি করি। আমাদের সমাজে যদি সত্যিই কোন গাদ্দার থেকে থাকে, তা'হলে পাকিস্তানের আজাদী, পাকিস্তানের তরক্কী ও পাকিস্তানের অখণ্ডত্বে যারা বিশ্বাসী তারাই - অর্থাৎ জনগণের আদালতই তার উপযুক্ত বিচার করবে। এজন্যই দেখা যায়, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে যেখানে সমস্যার সমাধান হয়নি, সেখানে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে টেনে নামিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আমি সব সময়েই জনমতের উপর আস্থাবান এবং সব সময় জনমতকে মেনে চলব। আমি বিশ্বাস করি, একমাত্র জনমতই সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে পারে।"

গণতান্ত্রিক আদর্শে দৃঢ়ভাবে আস্থাবান ছিলেন বলেই জনাব সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু করতে পেরেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে কেবল তাঁর দলই সব ক'টি উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের যে ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, তাকে কার্যকরী করার মাধ্যমেই প্রকৃত গণকল্যাণ নিহিত। তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই এ সম্পর্কে তাঁর মতের চমৎকার বিশ্লেষণ মিলবে-"আমরা আমাদের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর একবারও আমাদের পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন আমরা চাই-ই চাই। যতদিন না প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত জনগণের অভাব-অভিযোগ শোনা যায়, ততদিন তাদের দাবি-দাওয়া পূর্ণ হতে পারে না। যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ীই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করেন; কিন্তু জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁরা কতখানি সংবেদনশীল ও সজাগ এবং জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের কতখানি সংযোগ আছে, তার উপরই তা অনেকখানি নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেকটা আইনপ্রণয়নকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই আইন রচনা নির্ভর করে; তাঁদের মানব হিতৈষণা আত্মস্বার্থের দ্বারা ব্যাহত হয়। যদি আইন প্রণয়নকারীগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হন, একমাত্র তা'হলেই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কারমূলক কাজ সম্ভব হতে পারে। ..... তাই আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা হবে দেশে যথাশীঘ্র সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা। নির্বাচনের ব্যাপারে আমি সরকারি কর্মচারীদের বরদাশত করব না। 'এদের ভোট দাও', 'ওদের ভোট দাও' বলে তাঁরা যেন ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার না করেন। তাঁদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে- তাঁরা পুলিশ কর্মচারী হোন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই হোন, কমিশনার হোন অথবা কোন দফতরের সেক্রেটারীই হোন। জনসাধারণের ভোটদানে অবাধ স্বাধীনতা থাকা চাই। আমার মতে এ-ই যথার্থ গণতন্ত্র। কিন্তু এর আগে জনসাধারণকে সঠিক পথ দেখানো ও সদুপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়ে তাতে অটল থাকতে পারে।" গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় মনে-প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই উত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন প্রথম সুযোগেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ "আমি এখন দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। যদিও আমি একজন আওয়ামী লীগার এবং এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি, তথাপি আমি আমার ভাইদের, বন্ধুদের ও কর্মীদের বলে দিতে চাই যে, আপনাদের সাহায্যে আমি জনসাধারণের কাছে যেতে চাই, তাদের সাথে মিলতে চাই বটে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাকে সুবিচার করতে হবে। আমি এখন দেখব না ব্যক্তিবিশেষ কোন দলের সমর্থক -আমার লোক, না আমার বিরুদ্ধাচারী।"

আমি জানি, গণতন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যে চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি, তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রথমেই আমি বলেছি, ইতিহাসের মতো বিস্ময়কর এ গতিশীল জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমার সাধ্যাতীত। তাই সে চেষ্টা আমি করব না, বরং এ গতিশীল জীবনের আরেকটি দিক সম্পর্কে এবার আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রাজনীতি জাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত ; খণ্ডের পরিবর্তে অখণ্ডের প্রতিই তার দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ। গণতন্ত্রের সাধক সোহরাওয়ার্দীর ভাবাদর্শ ও কর্মজীবনের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে, সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে কর্মোদ্যোগ গ্রহণেই তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। বস্তুতঃ এ এক অনন্যসাধারণ মানসিকতা, যার নজীর এদেশে নাই বললেই চলে। সাবেক বাংলায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বসু প্রমুখ নেতার সহকর্মীরূপে কাজ করেছেন। বিশ্বাস ও মানসিকতায় তাঁরা এমনই একাকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, ঐতিহাসিক বসু-লীগ প্যাকটের মধ্য দিয়ে তাঁরা কলিকাতা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তিনিই সর্বপ্রথম একক ও অখণ্ড পাকিস্তানি জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের পক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানে এলে, যে-কোন সুউচ্চ প্রশাসনিক পদ লাভ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক প্রস্তাব তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ভারতে বিপন্ন মানবতার ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেননি। শান্তি মিশন নিয়ে তাই তিনি উল্কার মত দাঙ্গা-

www.pathagar.com

উপদ্রুত এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীকে সহায়তা করেছেন। আর্তত্রাণে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর এই মিশনের যৌক্তিকতা তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে ঃ "আপনারা জানেন, আমি ভারতেই রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন? এর কারণ, সেখানে আমাদের অনেক মুসলমান ভাই রয়ে গেছেন। তখন তাঁদের এক মহাপরীক্ষার দিন; দেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা তখন অধীনতাপাশেই আবদ্ধ। তাই তাঁদের দিকে চেয়ে আমি সেখানে রয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেই ভাইদের কথা কখনও আমাদের মন থেকে মুছে যেতে পারে না। আমরা কেমন করে তাঁদের কথা ভুলব? তাঁদের কোন দুঃখ-কষ্ট হলে আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। ওপারের ভাইদের কষ্ট হলে এপারের ভাইদের মনে দুঃখ হয়, আমি তাদের এ মনোভাবের সম্মান করি। এ মনোভাব মহান। আশা করি, এ মনোভাব চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে পত্র লিখেছি, "মহাশয়, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার প্রতি একটু ফিরে তাকান। আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সেখানে আমাদের বেচারা ভাইদের ভাগ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা জুটছে না, অথচ এখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে আমরা আমাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি।"

শুধু এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠাই নয়, পাকিস্তানের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ এবং জাতীয় ঐক্যের বিকাশেও জনাব সোহরাওয়ার্দীর দান অনন্যসাধারণ। তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যেদিন অসাম্প্রদায়িক জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠিত হয়, সেদিনই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের রাজনীতিতে খণ্ডিত জাতীয়তার পরিবর্তে সার্বিক জাতীয়তাবোধের প্রথম সফল উন্মেষ ঘটে বলা চলে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে তখন দেশের অধিকাংশ দল ও নেতাই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন; এমনকি করাচিতে গণপরিষদ ভবনের বাইরে তাঁর জীবনের ওপর হামলারও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু নিজের নীতি থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি। ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে তিনি যখন দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কিছুটা সুযোগ পান, তখন দেশের সাধারণ নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতির ওপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরক্ষণেই জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সেদিনের ভাষণ এদেশের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল হয়ে থাকবে। দেশকে একজাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যুক্ত নির্বাচনই একমাত্র হাতিয়ার-এ বিশ্বাসে ১৯৫৬ সালের ১০ অক্টোবর পার্লামেন্টের ঢাকা অধিবেশনে তিনি নির্বাচন পদ্ধতির বিলটি উত্থাপন করেন। যুক্ত নির্বাচন রুখবার জন্য প্রতিপক্ষ সেদিন ধর্মীয় আবেদন থেকে শুরু করে এক এক করে প্রত্যেকটি তীরই নিক্ষেপ করেন। কিন্তু নিজ বিশ্বাস ও ক্ষুরধার যুক্তি-জাল বিস্তার করে জাতীয় পার্লামেন্টের সারা রাত্রিব্যাপী ঐতিহাসিক অধিবেশনে সেদিন প্রতিপক্ষকে

www.pathagar.com

নিজ মতে দীক্ষিত করে তিনি কিভাবে তুমুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি পাস করিয়ে নেন, দেশবাসীর তা' অজানা নেই। জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন তাঁর ভাষণে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বলেছিলেন-"আজ আমরা দেশের অভ্যন্তরে বিভেদমূলক প্রবণতার সৃষ্টি করতে চাই না; একজাতি গড়ে তোলা তাই আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। সেই জন্যেই আমি যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী। কারণ, কেবল এ পদ্ধতিই দেশের সকল মানুষের সমন্বয়ে একটি বিরাট পাকিস্তানি জাতি গঠনে সহায়ক। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মধ্যকার বিভেদ, ঘৃণা আর সন্দেহের বীজ বিনষ্ট করে দিয়ে জাতির সেবার স্বার্থে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিতেও এ পদ্ধতি সাহায্য করবে। আমি পাকিস্তানি জাতি গড়ে তুলতে চাই। আমি চাই, দেশের সকল নাগরিকের একটি মাত্র আদর্শ থাকবে ; দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পাকিস্তানের সেবা করবে আর সবাই মিলে পাকিস্তানের সংহতি, স্থায়িত্ব ও গৌরব বৃদ্ধির ব্রতে দীক্ষা নিবে এবং সর্বোপরি মাতৃভূমির সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োজিত থাকবে। যুক্ত নির্বাচন বলতে এ কথাই বোঝায় যে, হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণ একত্রে ভোট প্রদান করবে। আমাদের আইন পরিষদে আমরা কি তা-ই করছি না? ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে আমরা কি একত্রে ভোট দেই নাই? আইন পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর আমরা মুসলমান এবং অ-মুসলমানরা কি একযোগে ভোট দেই না? এই সেদিন পার্লামেন্টে স্পীকার নির্বাচনের সময়েও আমরা কি একই সঙ্গে ভোট প্রদান করিনি? যাঁরা মনে করেন যে, যুক্ত নির্বাচন ইসলাম-বিরোধী এবং পাপ, কেমন করে তা'হলে তাঁরা আজও এ পরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকছেন এবং অ-মুসলমানদের সাথে ব্যক্তির নির্বাচনে বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর একসঙ্গে ভোট দিচ্ছেন? প্রকৃত প্রস্তাবে এ জাতীয় পরিষদও তো যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই গঠিত, অর্থাৎ মুসলমান ও অ-মুসলমান সমন্বয়ে গঠিত প্রাদেশিক পরিষদদ্বয়ই একে নির্বাচিত করেছে। যুক্ত নির্বাচন ইসলাম বিরোধী, এ যুক্তি অন্ততঃ পরিষদের বর্তমান সদস্যদের কাছে বলে লাভ নেই; কারণ তাঁরা এ পরিষদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে নিজেরাই তো অনেক আগেই 'পাপে' নিমগ্ন হয়েছেন।"

ধর্ম ও মুসলমানত্বের দোহাই দিয়ে যাঁরা যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করে আসছিলেন তাঁদেরকে জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন প্রশ্ন করেন ঃ "পাকিস্তানই কি বিশ্বের একমাত্র মুসলিম দেশ? সৌদী আরব, মিসর, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, জর্দান এবং আফগানিস্তানেও শরিয়তই হচ্ছে বিঘোষিত আইন। এগুলো কি মুসলমান দেশ নয়? এদের কোথাও কি পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে? পরাধীনতার সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসনামলে তাদের দু'একটি দেশে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কে না জানে যে, সে প্রথা জনসাধারণকে বিভক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যেই বহাল রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা অভিন্ন নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করে মুসলামান ও অ-মুসলমানদের মধ্যকার সব

www.pathagar.com

বিভেদ তুলে দেয়নি কি? যুক্ত নির্বাচন ইসলাম সম্মত নয়, এ ফতোয় শুনলে সেসব দেশের প্রতিক্রিয়া কী হবে? তারা পাকিস্তান এবং তার 'মহাপুরুষদের সম্পর্কে কী ভাববে? এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবার ভার আমি জনসাধারণের উপরেই ছেড়ে দিলাম।"

যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানদের স্বার্থে ক্ষতিকর হবে বলে যাঁরা যুক্তি দিচ্ছিলেন তাঁদের জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী কয়েকটি তথ্য-প্রমাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ "তথাকথিত ত্রাণ কর্তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে পূর্ব পাকিস্তানের জীবনে যুক্ত নির্বাচনের অবদান সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেব। খুলনা জেলায় মুসলমান-হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান-সমান এবং সেখান থেকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক-পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন মুসলমান, ৭ জন হিন্দু। অথচ ৩০ জন সদস্যের সমবায়ে গঠিত সেখানকার জেলা বোর্ডে যুক্ত নির্বাচনের বদৌলতে নির্বাচিত হয়েছেন ২৮ জন মুসলমান এবং মাত্র ২ জন হিন্দু। পৃথক নির্বাচনে এ সদস্যসংখ্যা দাঁড়াতো ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন হিন্দু। ফরিদপুর জেলা বোর্ডে যেখানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুযায়ী ২৫ জন মুসলমান এবং ১১ জন হিন্দু সদস্য থাকার কথা, সেখানে যুক্ত নির্বাচনের বদৌলতে ৩২ জন মুসলমান এবং ৪ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দিনাজপুরে যেখানে পৃথক নির্বাচন অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে যথাক্রমে ১২ জন মুসলমান ও ৯ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা, সেখানে ২১ জনই মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একজন হিন্দুও সেখানে নির্বাচিত হন নি। পরিষদের কাছে এবং এর বাইরে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আমার তাই অনুরোধ, নির্বাচন প্রথার সমস্যাটিকে একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বার্থকেই আপনারা সর্বোপরি স্থান দিন। আমাদের জনসাধারণ ইসলামের জন্যে তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে। স্বভাবতঃই তাদেরকে ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা সহজ। উত্তেজনা ছড়ানো, বিক্ষোভের আগুন জ্বালানো বা ধ্বংসের বীজ বপন করা এতই সহজ, আর কোন কিছু গড়ে তোলার কাজ এতই কঠিন যে, যাঁরা বিরোধিতার হাতিয়ার হিসেবে এ সমস্যাটিকে ব্যবহার করছেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, গোঁড়ামি, ঘৃণা, আর অন্ধবিশ্বাসের আগুন না ছড়িয়ে আমাদের প্রিয় দেশের সকল অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং একতার সবল ভিত্তির উপর পাকিস্তানকে গড়ে তুলুন।"

যুক্ত নির্বাচন প্রথায় তা'হলে সংখ্যালঘুদের লাভ কি, এ প্রশ্নের জবাবও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশে হিন্দুরা মনে করেন যে, পৃথক-নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে তারা সব সময়ের জন্যই শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে থাকবে। একদিক থেকে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে হীনমন্যতায় ভুগবে, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মানসিকতা ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেব। একটি পূর্ণ জাতিত্বের ধারণা এবং এ সমস্ত মানসিকতা বিদূরণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থেরই অনুকূল। 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' শব্দটি বিলুপ্ত হলেই তাদের মঙ্গল।

www.pathagar.com

তাই হিন্দুরা যে এখন প্রতিনিধিত্বের হার নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং এক জাতিত্বের মঙ্গলকর দিকটিকেই স্মরণ করতে রাজি হয়েছেন, এতে তাঁদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"আমি বিশ্বাস করি, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমান এবং অ-মুসলমানগণ জাতির স্বার্থে ধর্মের বিভিন্নতার কথা বিস্মৃত হবেন এবং আমরা পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের প্রতি কোণে কাজ করে যাবো। এমনিতর কাজের মাধ্যমে আমরা এক জাতিত্ব অর্জন করতে পারবো এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা যেমন স্থানীয় সংস্থা এবং আইন পরিষদগুলোতে আমাদের জনসাধারণের সেবার ভিত্তিতে যোগ্য স্থান খুঁজে পাবো।"

বলাবাহুল্য, সেদিন জাতীয় পরিষদ জনাব সোহরাওয়ার্দীর এ ঐকান্তিক আবেদনে সাড়া না দিলে পাকিস্তানে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি আজ কী রূপ গ্রহণ করত, সম্ভবত তা অনুমানের ঊর্ধ্বে নয়।

গণতন্ত্রকে মূলমন্ত্র করে যিনি জীবনে জনসেবার রাজনীতি শুরু করেছিলেন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। এটাই হয়তো আমাদের জন্য আজ শেষ সান্ত্বনা। কেন তিনি গণতন্ত্রের জন্য জীবনভর সংগ্রাম করলেন, বৃদ্ধ বয়সেও কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করলেন, এ প্রশ্নের জবাব মিলবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালে 'ফরেন এফেয়ার্সে' লিখিত তাঁর এক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "দেশের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে যে একনায়কত্বের কথা বলা হচ্ছে, তাতে রোগ নিরাময় হবে না, রোগের চিকিৎসাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে মাত্র। যে সমস্ত দেশে ডিকটেটরী শাসন কায়েম হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারব, কিভাবে একটি নীতির মধ্যে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলে। ডিকটেটরী শাসনব্যবস্থা কখনই প্রতিভাবানদের জনসেবার দ্বার প্রশস্ত করে না। এটা বরং কোটারী বিশেষকে সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিভাবানদের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় ও অন্যদের সরিয়ে দেয়। জনমতকে মান্য করার ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যে একটা স্থায়ী একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় ডিকটেটরীর শাসনব্যবস্থায় তা' হতে পারে না। ডিকটেটরী শাসনব্যবস্থা শুধু গোঁয়ার্তুমির দ্বারা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তথ্য ও জ্ঞান বিতরণ করা এর কাজ নয় বরং এর অস্ত্র হচ্ছে প্রতারণা ও ছল-চাতুরী। এ শাসনব্যবস্থা মানুষকে শিক্ষার আলো দেয় না। ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে এরা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ও তাদের উপর প্রভুত্বের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। এরা যুক্তিরও ধার ধারে না। আমাদের দেশের দু'টি প্রদেশের মধ্যে স্বার্থ ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কঠিন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে; তাতে ডিকটেটরী প্রথায় শুধু একের উপর অপরের প্রভুত্ব বিস্তারের পথই প্রশস্ত করা যাবে। তাই আমাদের সর্বপ্রথম অত্যাবশ্যক কাজ হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিধান করা। আমরা যদি গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে অবাধ সুযোগ না দেই, তবে এ স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। গণতন্ত্রের যে

www.pathagar.com

ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, সেটা আমি জানি; কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই অবদান। তাই এর অনিবার্য ত্রুটি থাকবেই । কিন্তু এটাই একমাত্র সুনিশ্চিত পথ এবং এপথে চলেই রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ও পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। রাষ্ট্রের সংহতির জন্যই রাজনীতি যে অত্যাবশ্যক এবং রাজনীতিকগণ যে রাষ্ট্রেরই সেবক, একথা যারা বুঝে না, তারাই রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কুৎসা গেয়ে থাকে। রাজনীতি মানবতার সেবার একটা মহান উপায়।"

জনসাধারণের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার জন্যই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও জনাব সোহরাওয়ার্দী শেষ বয়সে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং জনসাধারণকে তাদের হৃত অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, ঐক্য এবং একমাত্র ঐক্যই হচ্ছে জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

জনাব সোহরাওয়ার্দী আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ রয়ে গেছে। দেশে তিনি যে গণ-জাগরণের উদ্বোধন ঘটিয়ে গেছেন তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং শক্তিশালী যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার মধ্যেই নতুন গণতান্ত্রিক প্রাণ-চেতনার স্পন্দন নিহিত বলেই আমার ধারণা। দেশ আজ যে সঙ্কটের সম্মুখীন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন-দর্শনের প্রজ্ঞার আলোকে তার প্রেক্ষিত বিচার এবং সমাধানের পন্থা নির্ণয়ও সম্ভবত অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বজনের কল্যাণপ্রসূ এ সমাধানের দিকে আমাদের সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে কি?

---

৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণ।

www.pathagar.com

বার বার কেবল একটি কথাই মনে পড়ে

শহীদ সাহেবের স্মৃতি-সভায় দাঁড়িয়ে বার বার কেবল একটি কথাই আমার মনে পড়ে। যে বাংলাকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব, যে বাংলার চিন্তা-সমৃদ্ধির অকপট স্বীকৃতি জানিয়ে মহামতি গোখেলও বলেছিলেন ঃ What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow, সে বাংলার ভাগ্যে এত লাঞ্ছনা, এত বঞ্চনা কেন ?

দূর অতীতের দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, মনের পর্দায় যখন এক এক করে এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ছবি আঁকি, পাকিস্তানের জন্মলগ্নের স্মরণীয় ঘটনাগুলো যখন মনে পড়ে, আর এ-দেশের বিগত দুই দশকের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের যখন খতিয়ান করি, তখন কেবল একটি সত্যই আমার চিত্তকে আলোড়িত করে। সেই সত্যটিই আমি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমার এ আলোচনার দর্পণে আমাদের অনেকের চেহারাই হয়তো ধরা পড়বে; কিন্তু বিশ্বাস করুন, কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ আমার লক্ষ্য নয়; একটি সহজ-সরল সত্যের আলোকে দেশের অবস্থা পর্যালোচনাই আমার লক্ষ্য। এ সত্যের অকপট স্বীকৃতি আর তারই আলোকে আমাদের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলেই আমি একথা বলছি। এ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার অর্থ দেশ ও দশের ভাগ্যে সীমাহীন বিড়ম্বনার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা।

একদিকে যেমনি বাংলার ইতিহাস গৌরব ও বীরত্বের ইতিহাস, তেমনি অন্যদিকে বাংলার ইতিহাস ষড়যন্ত্রেরও ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতারও ইতিহাস। পলাশীর প্রান্তর থেকে শুরু করে আজতক ইতিহাসের ব্যত্যয় নেই, এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রমও লক্ষ্যগোচর নয়।

যে লাহোর প্রস্তাব আজ পাকিস্তানের ভিত্তিফলক হিসেবে স্বীকৃত, যে প্রস্তাবের স্মরণে বছর বছর ২৩ মার্চ উদযাপিত হয় পাকিস্তান দিবস হিসেবে, আর যে প্রস্তাবের স্মরণে লাহোর দুর্গের পাদদেশে সরকার ইদানীং 'পাকিস্তান মনুমেন্ট' প্রতিষ্ঠার কাজও সমাধা করেছেন, সে প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন এ বাংলারই মাটির মানুষের নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক। স্বাধীনতা সংগ্রামরত মুসলিম ভারতে বাংলার মর্যাদা আর তার পাশাপাশি শেরে বাংলার অসীম জনপ্রিয়তার দরুনই এ প্রস্তাবের উত্থাপক হিসেবে শেরে বাংলাকে সামনে রাখার প্রয়োজনীয়তা লীগ হাই-কমান্ডের সেদিন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর এক বছর না যেতেই দেখা গেল, শেরে বাংলা লীগ থেকে

www.pathagar.com

বহিষ্কৃত। ভাইসরয়ের সমর-পরিষদ থেকে পদত্যাগের জন্য যে পদ্ধতিতে লীগ হাই-কম্যান্ড থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তার যুক্তিবত্তার প্রশ্ন তোলায় শেরে বাংলা লীগ রাজনীতিতে অপাংক্তেয় গণ্য হন।

হক সাহেবের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিতেই প্রদেশে প্রদেশে মুসলিম লীগকে অবার সুসংগঠিত, আরও গতিশীল করার প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলিম সংহতির খাতিরে বাংলার মানুষ শেরে বাংলাকে সেদিন বাইরে রেখেই আজাদী-সংগ্রামে ব্রতী হয়। বাংলাদেশে শহীদ সাহেব মুসলিম লীগ সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে সত্যিকার গণমুখী সংস্থায় পরিণত করেন।

১৯৪৩ সাল থেকে জনাব আবুল হাশিমকে সঙ্গে নিয়ে শহীদ সাহেব দিনের আরাম, রাতের বিশ্রাম হারাম করে বাংলার পথে-প্রান্তরে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়ে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর নির্বাচনে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার ইতিহাস কারও অজানা নয়। বাংলার রাজনীতিতে সেদিন এ দুই নেতার যে প্রভাব ছিল, সমগ্র মুসলিম ভারতের অন্য কোন প্রদেশে আর কোন জননায়ক তা কল্পনাও করতে পারতেন না। নেতৃত্বের সংগে কায়েমী স্বার্থের যে সংঘাত তারই নিয়মে সেদিন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক জনাব সোহরাওয়ার্দীকে পর্যন্ত লীগ হাই-কম্যান্ড থেকে সর্ব প্রযত্নে দূরে রাখা হয়।

১৯৪৬ সালের পাকিস্তান ইস্যুতে নির্বাচনের পর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯ এপ্রিলের লেজিসলেটর্স কনভেনশনে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়, সেক্ষেত্রেও লাহোর প্রস্তাবের নিয়মেই বাংলার মর্যাদা ও শহীদ সাহেবের জনপ্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের ঃ "Areas in which Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zone's of India should be grouped to constitute Independent states in which constituent units shall be autonomous and sovereign"- অধ্যায়টি উড়িয়ে দেয়ার মতো কোন কারণ না ঘটলেও লেজিসলেটর্স কনভেনশনে তাই-ই করা হয় এবং পাস্তিানের নয়া রূপ-কাঠামো নির্দেশ ক'রে সাবজেকট কমিটিতে যে প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়, তা 'মুভ' করার জন্য আহ্বান জানানো হয় শহীদ সাহেবকে। সভাপতির নির্দেশে শহীদ সাহেব যখন প্রস্তাবটি পাঠ করেন, তখন জনাব আবুল হাশিম বৈধতার প্রশ্ন তুলে তাতে আপত্তি জানান। লীগ কাউন্সিলের লাহোর প্রস্তাবের অঙ্গহানির কোন অধিকার লেজিসলেটর্স কনভেনশনের নেই বলে জনাব হাশিম প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেন; কিন্তু লেজিসলেটর্সদের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে যায়। জনাব হাশিম তবুও নিরস্ত না হওয়ায় তাকে তখনকার মতন বোঝানো হয় যে, প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য বোম্বাইর লীগ কাউন্সিলে পেশ করা হবে। বলা বাহুল্য, এ আশ্বাস আশ্বাসই থেকে যায়; প্রস্তাবটি আর কখনো লীগ কাউন্সিলের সামনে পেশই করা হয়নি। ফলে, সমগ্র ব্যাপারটি একটি জগাখিচুড়ি পাকিয়ে থাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন বাংলা বিভাগের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন লেজিসলেটর্স কনভেনশনের প্রস্তাবটি আঁকড়ে থাকার আর কোন অবকাশ থাকে না। কেননা, সে

www.pathagar.com

প্রস্তাবের সুস্পষ্ট বিধান ছিল ঃ To constitute a sovereign state comprising Bengal and Assam in the North East Zone and the Punjab, North West Frontier provinces, Sind and Baluchistan in the North West Zone. অথচ বৃটিশ রাজ্যের সর্বশেষ ভারত বিভাগ পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলে Territorial re-adjustment-এর প্রশ্ন দেখা দেয়। শহীদ সাহেব তখন মুসলিম লীগের মূল লাহোর প্রস্তাবের বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গোটা বাংলাদেশ ও রেফারেন্ডাম এর মারফত আসামের যে এলাকা পাওয়া যাবে, তার সমন্বয়ে পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা পেশ করেন। এ প্রশ্নে পূর্বাহ্নেই তিনি লীগ হাই-কম্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলার হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য বঙ্গীয় মুসলিম লীগ মেসার্স শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নুরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ্ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী ও ফজলুর রহমানকে নিয়ে একটি সাব-কমিটিও গঠন করেন। বাংলার 'আন্দাজী বিভাগ' (National Partition) পরিকল্পনার পরিবর্তে গণভোটের (Plebiscite) মাধ্যমে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য শহীদ সাহেব যে প্রস্তাব পেশ করেন ভাইসরয় তা প্রত্যাখ্যান করায় ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে দিল্লীতে বসেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর যুক্ত বাংলার প্রস্তাব পেশ করেন এবং যুক্তিতর্ক ও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে সে প্রস্তাবের সারবত্তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

উপসংহারে তিনি বলেন ঃ "And let us pause for a moment to consider, what Bengal can be if it remains united. It will be a great country, indeed the richest and the most prosperous in India capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time it will be one of the most powerful and progressive states of the world. If Bengal remains united this will be no dream, no fantasy. Any one who can see what her resources are and the present state of its development will agree that this must come to pass if we ourselves do not comit suicide."

নিকট অতীতের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন ঃ

"I shall never forget how long it took for the government of India to realise the famine conditions in Bengal in the year 1943, how in Bengal's dire need it was denied food grains by the neighbouring province of Bihar, how since then every single province of India had closed its doors and deprived

www.pathagar.com

Bengal of its normal necessities, how in the councils of India Bengal is relegated to an undiginified corner while other provinces wield undue influence."

বাংলা বিভাগ রোধের প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন যে বক্তৃতা করেছিলেন, দৈনিক মর্নিং নিউজ তাকে remarkable speech অভিহিত করে বলেছিলো (অবশ্য এরাই কর্তার ইচ্ছায় শহীদ সাহেবকে পরবর্তীকালে এজন্য অপবাদও দিয়েছে)ঃ "If argument was ever required to show how fictitious, hollow, mischievous is the demand for the division of Bengal by a group of caste Hindus, Mr. H.S. Sohrawardy's remarkable speech at a press conferance in New Delhi is definitely the last word on the subject. His statement represents the genuine feelings of a realist, a fearless and frank patriot. None but dishonest persons without a conscience or vision would differ on the points raised in the statement."

শহীদ সাহেবের প্রস্তাবটির সমর্থনে ৩০ এপ্রিল তারিখে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এক দীর্ঘ সারগর্ভ বিবৃতিতে এক শ্রেণীর হিন্দুর বাংলা বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"Bengal today is standing at the crossroad– one leading to freedom and glory and the other to eternal bondage and abounding disgrace .....cent percent alien capital both Indian and Anglo-American exploiting Bengal is invested in West Bengal... And as such the growing socialist tendencies amongst us have created fear's of expropriation in the minds of our alien exploiters. They have the prudence to visualise difficulites in a free and united Bengal. It is in the interest of alien capital that the Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part there of may have strength enough to resist it in future. "

জনাব আবুল হাশিম তাই অত্যন্ত জোরাল কণ্ঠে আবেগময় ভাষায় সেদিন বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"Time has come when truth must be told. Surrendering to vulgar thinking for cheap popularity and opportunist leadership is intellectual prostituion.Only around 1905 Bengal was the thought leader of India and successfully challenged the might of the then British Govt. It is a pity that Bengal today is intellectually bankrupt and is begging and borrowing thought and guidance from alien heroes.

www.pathagar.com

.....The present revolutionary thinking of India owes its birth to Bengal. True revolution does not lie in internecine killing but in creating revolution in thinking and feeling. Sentiments and emotions have no place in serious thinking. Temporary insanity should not be allowed to influence future decisions. "

বলা বাহুল্য, বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এ পর্যায়ে বাংলার যা ইতিহাস তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইংরেজকে তাড়িয়ে হিন্দু আধিপত্যসহ সব রকমের বহিরাগত শাসন ও শোষণের সম্ভাবনা থেকে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানকে যুক্ত করার জন্য শহীদ-হাশেম প্রমুখ নেতা যখন এগিয়ে আসেন, তখন থেকে শুরু হয় আর এক নতুন চক্রান্ত। বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্যাণকর যে- কোন শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন লীগ মহল থেকে এদিকে যেমন শহীদ–হাশিম গ্রুপকে যত্নবান হতে বলা হয়, ঠিক তেননি বাংলার আর এক গ্রুপকে বলা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। গোপন কারসাজিরও অন্ত ছিল না। অন্যদিকে বাংলার স্বাধীনতাকামী হিন্দু বিপ্লবীদের হাতে বেনিয়া রাজত্বের প্রথমদিকে বাংলার মুসলমানদের বিভিন্ন আন্দোলনের আঘাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বৃটিশরা বিস্মৃত হতে পারেনি। ভুলতে পারেনি তারা রশিদ আলী দিবসের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শ্বেতাঙ্গদের লাঞ্ছনা ভোগের কথা। দ্বিতীয় ঃ বাংলার মাটিতে নিয়োজিত মূলধনের নিরাপত্তার প্রশ্নেও বৃটিশ সরকারের তখন দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। স্বভাবতই এই উভয়বিধ কারণে বাংলা বিভাগের মাধ্যমে বাঙালিদের উপর দাদ নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছিল বৃটিশের মজ্জাগত। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, এই বাংলারই এক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান নিছক পরস্পর জেদ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্র ও দেশী কারসাজির খপ্পরে যদি সেদিন পা না দিতেন, তা'হলে বাংলার চেহারা আজ ভিন্ন হত।

সেদিনকার সেই প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কারসাজির ফলে শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীর বাংলা বিভাগ রোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যাঁর অবদান ও নেতৃত্বে একমাত্র বাংলায়ই একটি শক্তিশালী মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল এবং তজ্জন্য পাকিস্তান হাসিল সম্ভব হয়েছিল, তাঁকে সুকৌশলে সেদিন লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তবু সেদিনও তাঁকে এই পরিস্থিতি হাসিমুখে মেনে নিতে দেখেছি।

কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে যুক্ত বাংলা সংগঠনের অভিযোগ আনয়ন করতঃ পাকিস্তান বানচাল করার অপবাদ দিতে লাগলেন। অথচ বাংলা বিভাগ রোধের পরিকল্পনা এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যবস্থা পর্যন্ত জিন্নাহ্ সাহেবের অনুমতিক্রমেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে যখন এ ধরনের হীন অভিযোগ আনা হয়েছিল, তখন লীগ হাইকম্যাণ্ডের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সততার এই যে অভাবের সূচনা হলো, আমার মতে জাতির বর্তমান দুর্গতির সূত্রপাতও এখানেই।

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করে। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই শুধু 'ছের কুচাল দেঙ্গের' মত হিংসাত্মক সুরে বিরোধীদলের প্রতি হুমকি দেন নাই, বরং তাঁদের এ অঞ্চলের দোসররাও সেই একই সুরে কথা বলেছেন। সেদিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানারূপ নির্যাতন চালান হয়; শহীদ সাহেবকেও 'ভারতের লেলানো কুকুর' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আজ যখন দেখি দলমত নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সবাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মুখর হয়েছেন, তখন অতীতের নির্যাতন ভুলে গিয়েও আজ এটাকে আমরা অভিনন্দিত করি।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন দলবিশেষের স্বার্থে দাবি করা হয়নি; দাবি করা হয়েছে পাকিস্তানের ভৌগোলিক কারণে, দাবি করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সমতালে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে পাকিস্তানকে একটি শোষণমুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করার তাগিদে। সুবিধাবাদ বা কোটারী স্বার্থের বেদীমূলে এদেশের ১২ কোটি মানুষের মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার যাতে বানচাল হয়ে না যায়, কারও রোষানলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন-যৌবন, মান-সম্ভ্রম যাতে ভস্মীভূত না হয়, তারই নিশ্চয়তা বিধানের জন্য। দাবি উঠেছে স্বাধীনতার নয়, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের। এ দাবি দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য রোধের দাবি, এ দাবি শ্বেতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পীতের শাসন কায়েমের দুর্বার আসক্তি রোধের দাবি। এ দাবি স্বাধীন পাকিস্তানের সকল নাগরিকের সমান অধিকার পত্তনের দাবি। একমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদীরা যাঁরা এদেশের একচ্ছত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে চান-প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অতীতে এ দাবিদারদের প্রতি জেল জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে, আজও করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও গণ-অধিকার এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বাধা কোথায়? এখনও কেন আমরা বিভিন্ন দলকে 'খণ্ড যুদ্ধে' লিপ্ত দেখি?

সেদিন বাংলাকে ভাগ করার জঘন্য পরিকল্পনা রুখতে গিয়ে ব্যক্তি বা কোটারী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে নিছক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যক্ষেত্রে এগুতে গিয়ে শহীদ সাহেবকে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পোহাতে হয়নি। তবু কারু বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কটাক্ষ তিনি করেননি। স্বভাবসিদ্ধ উদার মন নিয়েই তিনি সব কিছুর বিচার করেছেন। আক্রমণের পর অতিষ্ঠ হয়ে নিজের জন্য নয়, সমষ্টির জন্য খেঁদের সুরে কেবলই বলেছেন ঃ

"What is the use of hard words and vituperations? What is the use of vilifying me, attacking my bonafides expatiating on my sins of omisions and commissions and holding me responsible for all the ills in Bengal? What have the alleged shortcomings of the present Govt. or ministry, what have even my own position and individuality to do with what the people of Bengal can achieve if they remain united and co-operative with each other? It is not I who is offering them

www.pathagar.com

anything; it is for the people of Bengal to make and transmute their destiny by remaining together."

নজিরবিহীন অভিনব পদ্ধতিতে বাংলা ভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও শহীদ সাহেবের মানবদরদী মনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি সদা প্রকট। তিনি বলেছিলেন ঃ

"The agony is over. Independent sovereign Bengal has been stabbed in the back and Bengal will soon be partitioned. Muslim Bengal has little to grieve for. We would have preferred to have had a homogeneous unity, where left to our resources we could have fashioned one of the most progressive and prosperous nation of the world , but we were not destined to march together."

"Muslim Bengal will now have to stand on its own legs and in this process to attain the fullest heights of its stature. As a part of Pakistan its food supply will be ample. As a grower of jute it can have the world at its feet and its industrial future is secure."

"In the Pakistan legislature Muslim Bengal will have a powerful voice and will be able to contribute to the growth of the constitution, to the framing of policy and to the prosperity of Pakistan... we are no more hangers on of the majority population of Hindustan and I am sure our political importance and economic resources will make us more welcome in the council of nations than a people imbued with the doctrine of isolation whose internationalism is a pose and whose assumption of Asian hegemony a flop."

"Though India stands divided, Hindus and Muslims have still to live with each other intermingled as before; only the responsibility of looking after the welfare of the people has shifted to new shoulders ... The road has parted. Let us go each our different ways with feelings of friendship towards each other and let us for the future drop all talk of retaliation and all threats of bringing others down to their knees and forcing them to sue for mercy."

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিকতার মূর্ত প্রতীক শহীদ সাহেব নিজে যা সত্য ও কল্যাণকর বলে মনে করেছেন তারই তিনি সাধনা করেছেন এবং সংগ্রাম করেছেন তার জন্য। কিন্তু অধিকাংশের রায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে, মূর্তিমান অবিচার বলে পরিগণিত হলেও সেই রায়ই তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। বাংলা ভাগকেও তিনি তাই অকৃত্রিম আগ্রহ ভরেই গ্রহণ করেছেন; ছক কেটেছেন বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সুখ-সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের, স্বপ্ন দেখেছেন সুবিপুল সম্ভাবনার। কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি। হয়নি সেই একই নিয়মে-বাঙালির সেই বিশেষ চারিত্রিক দোষে-সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির সুযোগসন্ধানী, স্বার্থ-শিকারি তৎপরতায়।

স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন ও সাধনার রূপকার হয়েও শহীদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে প্রবেশাধিকার পাননি; বহিষ্কৃত হয়েছেন। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন মহল তাঁর পাকিস্তান আগমনকে ভাল চোখে দেখেননি। নাগরিকত্বের প্রশ্ন তুলে প্রথম সুযোগেই তাঁর গণ-পরিষদের সদস্য পদটি নিয়েছেন ছিনিয়ে অথচ কোলকাতায় থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ ভারতীয়ের সদস্য পদ অক্ষুণ্নই রাখা হয়েছে। অভিসম্পাত করা হয়েছে শহীদ সাহেবকে 'ভারতের লেলানো কুত্তা' বলে। এত লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা সত্ত্বেও শহীদ সাহেব নির্বিকার চিত্তে মনোনিবেশ করেছেন একদলীয় শাসনের দাপট থেকে জনগণের নিরাপত্তা বিধানের মানসে বিরোধীদলের গোড়াপত্তনে। তবু তাঁর সাধনা অপূর্ণ রয়ে গেছে। বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার সেই একই নিয়মে ব্যত্যয় ঘটেছে নিয়ম-তান্ত্রিকতার। ব্যুরোক্রাট গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কলমের খোঁচায় বরখাস্ত করেছেন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বাঙালি মোহাম্মদ আলী খাজা সাহেবের সেই শূন্য আসনে। এটা অবশ্যই 'ব্যুরোক্রাটদেরই' খেলা ছিল।

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ে কায়েমী স্বার্থের যখন নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলাকে বরখাস্ত করিয়ে 'ব্যুরোক্রাট' ইস্কান্দার আলী মীর্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্তির পর শেখ মুজিব ও ৩৫ জন পরিষদ সদস্যসহ তিন সহস্রাধিক যুক্তফ্রন্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনকারী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কলমের খোঁচায় এভাবে দুই মাসের মধ্যে বরখাস্ত করে সারা প্রদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। তৎপর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' পলিসি অবলম্বন করে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরান হয়। এভাবে গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাফল্য সূচিত হয়।

এ প্রসঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপরও কিছুটা আলোকপাত করা আমি প্রয়োজন মনে করছি। যুক্তফ্রন্ট আমলের পর সামরিক শাসন ও বর্তমান মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে দেশে সেই একই নিয়মে রাজনীতি চলেছে। দুর্বলের উপর সবলের শাসন আরো জোরেসোরে জেঁকে বসেছে। কেবল বাংলায় নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে

www.pathagar.com

একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োজিত করে গণবিরোধী শাসন কায়েম রাখার এক অভিনব ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে। গণতন্ত্রের অধীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য, এমনকি কোন্দলও থাকতে পারে, অথচ তারই সুযোগ নিয়ে যারা এমনিতেই কোণঠাসা, সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে আরো কোণঠাসা করার ব্যবস্থা জারি রয়েছে। বহু কিছুর পর শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জনগণের যাও-বা কিছুটা মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল, D.P.R -এর মারণাস্ত্রের আঘাতে তাও হরণ করা হয়েছে। Constitutional শাসনের পরিবর্তে ইমার্জেন্সির নামে দেশের ১২ কোটি মানুষ বস্তুত ঃ D.P.R দ্বারাই শাসিত হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে জনগণের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করা কারও বা কোন দলের একক সংগ্রামে সম্ভব নয়।

শহীদ সাহেবের দূরদৃষ্টি ছিল সন্দেহাতীত। তাই কারাগার থেকে বেরিয়ে এ সত্য তিনি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন নেতৃত্বের রেষারেষি, দলীয় কোন্দল ও অনৈক্য এ লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে না কখনও। কারাবাসের পর ঢাকায় এসে পল্টনের জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, যে-দেশের সবাই গোলাম সে-দেশে নেতা কে? গোলামের নেতাতো সবচেয়ে বড় গোলাম। আমরা আজ তাই সবাই কর্মী, কেউ-ই নেতা নই। বস্তুতঃ শহীদ সাহেবের এ-কথা ভনিতা নয়। তাঁর বিশ্বাসেরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র।

শহীদ সাহেবের কারামুক্তির পর সারা পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে যে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে, তারই ফলে খর্বিত আকারে হলেও মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয় (আইয়ুব শাসনতন্ত্রে যা অনুপস্থিত ছিল)। সেই দুর্বার আন্দোলনের পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আক্তার হোসেনের নেতৃত্বে দুইজন বিচারপতিসহ পাঁচ সদস্যের একটি ভোটাধিকার কমিশন গঠন করেন। কমিশন সর্ব পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট পদ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেন। এ সময় প্রেসিডেন্সিয়াল মন্ত্রিসভার সদস্যরাও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন। কিন্তু শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ঘরে বসে পড়েন। ফলে, সে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং আইয়ুব তাঁর নিজের নিযুক্ত ভোটাধিকার কমিশনের রিপোর্ট নিজেই আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেন।

আজইবা আমরা কি দেখছি? সবাই আমরা কেবল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প প্রকাশ করছি। পারস্পরিক ঐক্যের বুলিতেও কেউ আমরা কারো চেয়ে কম যাই না। অথচ এক নেতার সঙ্গে আলাপে বসলে অপরের কুৎসা ছাড়া আর কিছু এখন শুনি না। সবার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য না হলেও মোটামুটি অবস্থাটা আজ তাই। প্রবীণদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কমতি নেই; তাই বলে কেউ যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকেন, তবে তাঁর দ্বারা দেশের কোন খেদমত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা সত্যিকারে শ্রদ্ধাভাজন হন কেবল তখনই, যখন জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রশ্নে তাদের সঙ্গে একাত্মতাবোধে উদ্বুদ্ধ হন,

www.pathagar.com

এবং তাদের হয়ে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হন না। বিনা ত্যাগের নেতার অভাব আমাদের দেশে নেই। অতীতে যেমন আমরা তা দেখেছি, এখনও তা-ই দেখছি।

সারা দেশের মানুষ যখন আজ অধিকারহারা, জীবন সমস্যায় আজ যখন তারা জর্জরিত, তখনও আরাম কেদারায় বসে কেবল সংগ্রামের কথা বলা ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। যে নেতৃত্ব সংগ্রাম-বিমুখ, জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রভৃতি প্রশ্নকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে থাকেন, তাঁরা যে শুধু নিজেরাই সংগ্রাম বিমুখ তাই নন, যাঁরা সংগ্রামরত, যাঁরা জীবনের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন, তাঁদেরকেও হেয় করা যেন এঁদের কারও কারও বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ নিতান্তই আফসোসের ব্যাপার।

সব মিলিয়ে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অভিনব রূপ নিয়েছে। যে পশ্চিম পাকিস্তানকে আমরা সাধারণত ভূ-স্বামী প্রপীড়িত আন্দোলন-বিমুখ মনে করতাম, আজ তারাও গণ-অধিকার কায়েমের সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার, প্রাইমারী স্কুলের কচিকাঁচা শিশু, এমনকি মহিলারাও রাস্তায় নেমে পড়েছে। নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধর-পাকড় চলছে। নির্যাতনের মুখেও আন্দোলনের গতি অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কতগুলো দাবি মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এর দ্বারা জনগণের মৌলিক দাবিসমূহের কোন সুরাহা হয়নি। এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে নতুন নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটেছে। এয়ার মার্শাল আসগর খান গণ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্রত নিয়ে রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। রাজনীতিতে এঁরা নবাগত হলেও এঁদের প্রতিভা, সততা ও দক্ষতা সর্বজনবিদিত। নবাগতদের রাজনীতিতে দেখে কারও ভ্রুকুঞ্চিত করার অবকাশ নেই। কারণ, দেশ গঠনের কাজে আমাদের বহু প্রতিভাবান লোকের প্রয়োজন। দেশ গঠন কখনও 'ইয়েসম্যান' দ্বারা সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে রাজনীতিতে নবাগতদের আমরা অভিনন্দন জানাব। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁদেরকে আমরা জানাব যে, কেবল প্রতিভার দ্বারাই রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। তাঁদেরকে জনগণের কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে- কোন ত্যাগ স্বীকারেও অভ্যস্ত হতে হবে। দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিতে হবে। তরুণ-প্রবীণের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশবাসীর স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিতে হবে। তরুণ-প্রবীণের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, দেশে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক, দেশ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হোক, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূত-স্মৃতি বিজড়িত এই দিনে এই-ই আমার কামনা।

১৯৬৮ সালের ৫ ডিসেম্বর, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

www.pathagar.com

মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের উত্তরাধিকার

মাত্র একটি বছর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিনি। তবু মনে হয়, চার দেয়ালের আড়ালে শারীরিকভাবে বন্দী থাকলেও আমি যেন গতবারও আপনাদের সঙ্গেই ছিলাম, যেমন আজ আছি। অতীন্দ্রিয় চৈতন্যে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা আজকাল বড় কম। এখন আমরা সকলেই কম-বেশি বস্তুবাদী। কিন্তু এ বস্তুর ঊর্ধ্বে যে নির্বস্তু ও নির্জ্ঞান মনের সীমানা, সেখান থেকে যেন মাঝে মাঝে সাড়া পাই। সেই সাড়া বিশ্বাসের, সেই সাড়া প্রত্যয়ের, সেই সাড়া মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের উত্তরাধিকারের। চার দেওয়ালের নিশ্ছিদ্র আড়ালে থেকেও তাই সেদিন বিশ্বাস হারাইনি, আপনাদের সঙ্গে মনের যোগ নষ্ট হয়নি। আপনারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অকম্পিত হাতে স্মরণের যে অনির্বাণ আলো জ্বেলেছেন, চার দেয়ালের প্রস্তর ভেদ করে তা আমাদের মনের মণিকোঠায় প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তির স্মরণ নয়, এক আদর্শের সুমহান স্মরণ থেকে প্রত্যয়বোধে উজ্জীবিত হয়ে মনীষী রোঁমা রোঁলার একটি বাণীই সেদিন আমার কানে ভেসেছে ঃ I will not rest.

ব্যক্তির স্মরণ নয়, আদর্শের স্মরণ থেকে যে অমিত সাহসের সঞ্চরণ, সেই সাহস সঞ্চরণের এক অফুরন্ত উৎস শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এখন আর আমার কাছে কোন ব্যক্তির নাম নয়, এক আদর্শের নাম। যে আদর্শের জন্য তিনি নিজে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, নিজের সৃষ্ট পাকিস্তানে গুরুতর অপবাদ নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে কারালাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যে আদর্শের জন্য আজও পাকিস্তানে অসংখ্য দেশপ্রেমিক হাসিমুখে সব লাঞ্ছনা-নির্যাতন সহ্য করছেন, সে আদর্শের তো মৃত্যু হতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ী এ আদর্শের ভাস্বর প্রতীক শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাই আমার কাছে মৃত নন। তাঁর নশ্বর দেহমাত্র এখানে সমাহিত। কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর আত্মা ও আদর্শের জীবনসংগ্রাম জড়িয়ে আছে আমার, আপনার সকলের মাঝে। 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী' এ একটি নামে আমরা আজও তাই উজ্জীবিত, সম্মিলিত ও প্রাণবন্ত। আমাদের শাসক-শক্তির ভয়টাও এখানেই। তাঁরা জানেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণ-অধিকারের অতন্দ্রপ্রহরী। তাঁর জীবনে সকল শক্তির উৎস ছিল জনসাধারণ আর জনসাধারণেরও সকল আশা- আকাঙ্ক্ষার বিশ্বস্ত নির্ভর ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নেতা আর জনতার এ অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রকে বহুবার কেটে নেয়ার চেষ্টা করেছে কায়েমী স্বার্থ আর গণ-অধিকারের শত্রুরা। তাঁর জীবনকালে তা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর পরে তা সম্ভব হবে

www.pathagar.com

তা মনে করার কোন কারণ নেই। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে এখন বাতি জ্বলে না। পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি যেখানে তাঁর নশ্বর দেহ রেখেছেন, সেখানে এখনো কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়নি। এমনকি, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় তাঁর নামে একটা রাজপথের নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু তাতে কি শহীদ সোহরাওয়ার্দী জনমানস থেকে বিস্মৃত হয়েছেন? নির্বাসিত হয়েছেন? না, তিনি তা হননি। বরং তিনি নতুন করে জেগে উঠেছেন গ্রাম-বন্দর-জনপদে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোটি মানুষের প্রাণতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিস্তম্ভ। শক্তির প্রতাপ এ স্মৃমিস্তম্ভের ভিত্তি নয়; এর ভিত্তি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণ-মানুষকে ভালোবাসতেন; আর দেশের গণ-মানুষ নেতার প্রতি উজাড় করে দিয়েছে তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।

আপনাদের কাছে বলতে আমার দ্বিধা নেই, বুদ্ধি আর হৃদয়ের এমন সমন্বয় আমি আর কোন নেতার মধ্যে দেখিনি। তিনি আবেগহীন ছিলেন না, কিন্ত তাঁর আবেগ ছিলো বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার কোন কোন তরুণ বুদ্ধিজীবী বন্ধু মনে করেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানে ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা বা লিবারেলিজমের শেষ প্রতীক। এ উদারনৈতিকতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্যই তিনি গণতন্ত্রের জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। আমার এ বন্ধুদের অবগতির জন্য আমি শুধু একটি কথাই বলব, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকরূপে, তাই বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী আধুনিক অর্থে একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন এমন কথা আমি বলব না। ঊনিবংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার সঙ্কট শুরুর সূচনায় একদিকে বলশেভিকিজম এবং অন্যদিকে ফ্যাসিজমের আবির্ভাবে পীড়িত বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নতুন মূল্যায়ন শরু হয়, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এ মূল্যায়নপর্বের চিন্তা-ভাবনার অনুসারী। সমাজে বা রাষ্ট্রে ব্যক্তির শুধু রাজনৈতিক অস্তিত্বের বা স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি নয়, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠারও স্বীকৃতি ছিল এ নয়া চিন্তা বিপ্লবের মূল সূত্র, রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী শক্তি যেন ব্যক্তি বা সমাজকে গ্রাস না করে; আবার ব্যক্তির যথেচ্ছাচার দ্বারাও যেন সমাজের বা রাষ্ট্রের বিপুলায়তন অংশ শোষিত ও পীড়িত না হয়, সেটাই ছিল এ নব্য গণতান্ত্রিক দর্শনের লক্ষ্য। এ দর্শন থেকেই ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ-রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ অতি আধুনিকতম ভাবধারার অনুসারী ছিলেন বললে ঠিক বলা হবে। এ ভাবধারা বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা থেকে স্বতন্ত্র এবং সর্বগ্রাসী সমূহবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ কল্যাণ-রাষ্ট্রতত্ত্বের চমৎকার প্রয়োগমূলক বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে। স্বাধীনতার আমলে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে নবাব-নাইট-জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পশ্চাৎগামী সামন্ত নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর প্রাগ্রসর চেতনার দ্বন্দ্বের ফল। এ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ অবিভক্ত বাংলায় তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেও ঘটেছিল।

www.pathagar.com

তিনি তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের দাবী মেনে নিতে পরিষদে উত্থাপনের জন্য বিল প্রণয়ন করেন এবং তা গেজেটভুক্ত হয়। এতে মুসলিম লীগের জমিদার-জোতদার নেতৃত্ব ভয় পেয়ে যায় এবং তাঁকে অপসারণের জন্য দিল্লীতে লীগ হাই কমাণ্ডের কাছে ছুটাছুটি শুরু করে। দিল্লীর হাই কমান্ড নাজুক পরিস্থিতির অজুহাতে এ বিতর্কমূলক বিল পরিষদে উত্থাপন না করার নির্দেশ দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরাজয়ের মূল কারণ ছিল এটাই; লীগের পশ্চাৎগামী সামন্ত নেতৃত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের মধ্যে তাদের কায়েমী স্বার্থের আশু বিনাশের আশঙ্কা দেখতে পেয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও এ কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর লড়াই থামেনি। দেশে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ও আমলাতন্ত্রের প্রতাপ বৃদ্ধিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর বিপদের সূচনাতেই তিনি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশে একচেটিয়া পুঁজি ও আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ তাঁর এ সংগ্রামী মনোভাব এবং আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্র চিন্তারই বাস্তব প্রকাশ।

গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনায় সময় নষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবিচল সংগ্রামী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আপনারা দেখেছেন। এ-দেশে একদলীয় ও আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের আন্দোলনের ভিত্তি সূচনা করেন। আবার এ-দেশ থেকে যেদিন গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেয়া হয় সেদিন গণ-মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ দেহে চারণের বেশে দেশের প্রতিটি প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন; সকল অপবাদ মাথায় তুলে নিয়েছেন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এমনকি, গণ-অধিকারের জন্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিদেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নিজের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-চিন্তাকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজেই প্রকাশ করে গেছেন মাত্র কয়টি কথায় ঃ "কোন ব্যক্তির খেয়াল নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে। গণতন্ত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে আমি সচেতন; কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি, তাই এর অপরিহার্য ত্রুটি আছে। কিন্তু মোটের উপর, গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রগতি ও বিবর্তনের একমাত্র নিশ্চিত পথ। একে শধু সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই দিতে হবে না, বরং একে রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, নির্ভুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।"

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গণতন্ত্র যে শুধু একটি প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিই ছিল না, বরং সামগ্রিক জীবন-দর্শন ছিল, তাঁর জীবনের বহুমুখী কর্ম-প্রবাহ থেকেও তার প্রমাণ মিলবে। সাবেক ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর দেশ ও জাতির জন্য 'নিবেদিত প্রাণ' নেতারা যখন জনগণের সেবার নামে দাঙ্গা-উপদ্রুত কলকাতায় কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘুকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দ্রুত পদ্মা পাড়ি দিলেন, সেদিন মসনদের মোহ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিচলিত করেনি। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি সেদিন শুধু কলাকাতায় থাকেননি, দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকাগুলোতে উল্কার মতন ঘুরে বেড়িয়েছেন।

www.pathagar.com

ভারতের বিপন্ন কয়েক কোটি অসহায় সংখ্যালঘুর কাছে সেদিন তিনিই ছিলেন একমাত্র ভরসা। গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি শান্তি-মিশনে বেড়িয়েছেন; শান্তি স্থাপন করেছেন। শান্তি-মিশন নিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও শুভেচ্ছা সফরে এসেছেন। এ-সময় রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ দূতের পদ থেকে আরম্ভ করে তাঁকে বহু উচ্চপদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিপন্ন সংখ্যালঘুর প্রতি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করে এসব প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ ভূমিকারও সেদিন কদর্থ করা হয়েছে। বিপন্ন সংখ্যালঘুর জন্য ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে যে নেতা সেদিন ভারতে সাময়িকভাবে থেকে গেলেন, তাঁকে বলা হলো "ভারতের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি" আর দাঙ্গা-বিরোধী তাঁর শান্তি-মিশনের ভূমিকাকে আখ্যা দেয়া হলো "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ।" শুধু তাই নয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানকে ভারত ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চক্রান্ত করছেন বলেও জঘন্য প্রচারণা চালানো হলো। এসব অপপ্রচারের জবাব দেয়ার প্রয়োজন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনুভব করেননি। তিনি সে সময় শুধু সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর শান্তি-মিশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "পূর্ব পাকিস্তানের এখনো কিছু করার সময় আছে। যদি হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করা না যায় বা তারা দেশে ফিরে না যায়, তা'হলে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম বঙ্গে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তিক্ততা বাড়বে। ফলে, মুসলমানদের পশ্চিম বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে চলে যেতে হবে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই ভারতের সমস্ত মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। আমার নিজের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, পাকিস্তানের হিন্দু এবং ভারতের মুসলমানদের জন্য শান্তি স্থাপনের কাজ আমাকে চালিয়ে যেতে হবেই।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা সেদিন কতটা নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত ছিল। পাকিস্তানের সেই শৈশবেই ভারত থেকে বাস্তুত্যাগী মোহাজেরদের ভীড়ে পাকিস্তানে এক মস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন পূর্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ মোহাজের সমস্যা দেখা দিলে শিশু রাষ্টে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তার কতটা ভার সইতে পারতো, আজ তা ভাবতেও শঙ্কা জাগে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর জীবদ্দশায় এ নিঃস্বার্থ দেশ-সেবা ও জন-সেবার স্বীকৃতি পাননি, বরং তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা প্রচার করা হয়েছে। শুধু তাঁর মৃত্যুর পরই শোনা গেলো, এত দিন যা প্রচার করা হয়েছে, তা সত্য নয়। এখন অনেকেই তাঁর সেদিনকার নিঃস্বার্থ জনসেবা ও ত্যাগের প্রশংসা করছেন এবং বলেছেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতে অবস্থান না করলে সেখানকার চার কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানের ভাগ্যে কি ঘটতো তা বলা যায় না। শুধু ভারত বা পাকিস্তানে নয়, উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে তিনি নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিরাট বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।"

একথা বোধ হয় অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান ও ভারতের আজকের অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে। দু'টি প্রতিবেশী দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় না ঘটলে আজকের অনেক গুরুতর

www.pathagar.com

সমস্যার উদ্ভব ঘটতো না; এবং দু'দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি হতো না। এ জটিলতা আজ পাকিস্তান এবং ভারত এ দুই দেশের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনেতার গুণাবলি ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রভাতেই দু'দেশের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু উপলব্ধি করা নয়, এ সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি ৮ দফা পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু সেদিন পাকিস্তান বা ভারত– কোন দেশের ভাগ্য নিয়ন্তারাই এ পরিকল্পনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন মনে করেননি। যেদিন তাঁরা প্রয়োজন মনে করলেন, সেদিন উভয় দেশেই অনেকগুলো ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে গেছে। নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে দু'দেশের সম্পর্কই বিপদসীমার শেষ রেখায় এসে পৌঁছে গেছে। এ ভয়াবহ বিপদ এড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রণীত হলো লিয়াকত– নেহরু চুক্তি। সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য প্রণীত এ চুক্তিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৮ দফার অধিকাংশ দফাই গৃহীত হতে দেখা গেলো। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে; দু'দেশের অনেকগুলো নিরপরাধ প্রাণ অকাল জীবনের তাজা বৃন্ত থেকে ঝরে গেছে।

সংখ্যালঘু সমস্যা, তথা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আন্তরিক প্রচেষ্টার আর একটি বড় কারণ, গণতান্ত্রিক জাতীয়তায় তাঁর অবিচল আস্থা। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় জাতীয়তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানে এক মহাজাতি পত্তনের প্রাণ-বীজ বপন। তাঁর নিজের ভাষায়, "হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সী বা বৌদ্ধ অর্থাৎ এ-দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যে-দিন বৈষম্যমুক্ত, সমমর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশে কেবল পাকিস্তানি হিসেবে বসবাস করতে পারবে, সেই দিনটিরই অপেক্ষায় আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।" জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে শক্তিশালী এবং নির্ভরশীল ভিত্তি আর কি হতে পারে, আমি তা জানি না। আজ দেশে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার নানা প্রকার কষ্টকল্পিত শ্লোগান তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এ শ্লোগানের আড়ালে দেশের দুই অংশের মানুষ ক্রমশঃই যেন পরস্পরের কাছে বেশি অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, পূর্ব পাকিস্তানে আজ গুটিকয় প্রবীণ নেতা ছাড়া, এখন এমন এক ডজন নেতা পাওয়া যাবে কিনা, যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত। এর কারণ কি? বিশ বছরের এক জাতিত্ব, এক রাষ্ট্র-কাঠামোর বন্ধনও কেন আমাদের পরস্পরের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে পারলো না? এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব, দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন কৃষ্টির অধিকারী নাগরিকদের মাধ্যে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও সম্পর্ক সৃষ্টিতে রাষ্ট্র-পরিচালকদের অপারগতা বা অনীহা; যে সমমর্যাদাসম্পন্ন পরিবশে দেশের দুই অংশের মানুষকে বা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে ভৌগোলিক বা অন্য যে-কোন দূরত্ব হ্রাস করে ঘনিষ্ঠ করে তোলে, দেশে তেমন পরিবেশের অভাব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোই এর একমাত্র প্রতিকার। বিভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি ও জাতীয়তার মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদের দেয়াল তুলে শাসন-শক্তির

www.pathagar.com

অখণ্ড প্রতাপ দ্বারা জাতীয় সংহতি বা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা যায় না। জাতীয় সংহতির মূল ভিত্তি জাতির সকল বর্ণের, সকল ধর্মের, সকল ভাষাভাষী মানুষের স্বেচ্ছা-বন্ধনের মধ্যে, স্বেচ্ছা-সহযোগিতার মধ্যে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ স্বেচ্ছা-বন্ধন আর স্বেচ্ছা-সহযোগিতার বাণী নিয়েই গেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের কাছে, এসেছেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে। দেশের দুই অংশের মানুষের কাছেই তাই তিনি ছিলেন সমান প্রাণপ্রিয় নেতা- 'জনমন গণ-অধিনায়ক'। দেশের দুই অংশের সবচেয়ে নির্ভরশীল বন্ধন ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। খাইবার থেকে চট্টল পর্যন্ত একটি মানুষের ডাকে এমন উদ্বেল জনসমুদ্র সৃষ্টি সত্যিই ইতিহাসে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী যেদিন লোকান্তরিত হলেন, সেদিন সর্বপ্রথম এ একটিমাত্র কথাই আমার মনে হয়েছে যে, দেশের দুই অংশের প্রকৃত মিলন প্রতীকটি আজ আমরা হারালাম। দেশের দুই অংশের সবচেয়ে বড় বন্ধনটি (link) যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করে, কি ইতিহাসের আলোড়ন থেকে ব্যক্তির সৃষ্টি হয়, এই বিতর্কে আমি প্রবৃত্ত হব না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজেই ছিলেন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের প্রয়োজনে যদি তাঁর আবির্ভাব হয়ে থাকে, তা'হলে বলব, ইতিহাসের সেই প্রয়োজন তিনি যথাযথভাবে পূরণ করেছেন। আর যদি ইতিহাস সৃষ্টির জন্য তাঁর জন্ম হয়ে থাকে, তা'হলে বলব, দেশ ও জাতির জন্য তিনি ইতিহাসে অনন্য উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন। এ ইতিহাস জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। আইনজীবী সোহরাওয়ার্দী, রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দী, জন-নায়ক সোহরাওয়ার্দী, রাষ্ট্র-নায়ক সোহরাওয়ার্দী— যে-কোন ভূমিকাতেই সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আইনের শাসন আর গণ-অধিকারের অতন্দ্র প্রহরী। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্যের মূল উৎস ছিল জনসাধারণের প্রতি অকৃত্রিম আস্থা আর ভালোবাসা। এ আস্থা আর ভালোবাসা নিয়ে জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল অংশ, এমনকি দুর্বৃত্তের মুখোমুখি হতেও তিনি কখনো ভয় পাননি। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর বিশ্বাস তাঁকে এতটা বলীয়ান করে তুলেছিল যে, বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও তিনি ভয় পাননি। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা দাঙ্গার সময়ে বিনা প্রহরায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকায়। একবার ভবানীপুরে সশস্ত্র গুণ্ডারা তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে। নিরস্ত্র সোহরাওয়ার্দী নির্ভয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন। বললেন, "আমাকে মারলে যদি সমস্যার সামধান হয় তা'হলে আমাকে মারো।" গুণ্ডারা তখন অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। পরের বছর গান্ধীজীর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ে বেলেঘাটায় তাঁর গাড়ি (বি,এল,এ, ২০০০) লক্ষ্য করে একদল লোক হাতবোমা ছোঁড়ে। ফলে, গাড়ির সামনের অংশ উড়ে যায়। গান্ধীজী সোহরাওয়ার্দীর জীবন নাশের চেষ্টার খবর শুনে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুর্বৃত্তরা তখন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা পাকিস্তানেও দেখেছি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের সময় পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে তিনি আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হন। সামরিক শাসন

www.pathagar.com

প্রত্যাহৃত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক গণ-সংযোগ সফরকালে শেষবার পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা হয়। আমরা তাঁর অনুসারী ভক্তেরা এতে ভয় পেয়েছিলাম; তিনি পাননি। দুর্ঘটনার পরে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর গণ-সংযোগ অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সাহস আর আত্মপ্রত্যয় গণ-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর আস্থা থেকে উৎসারিত। এ সাহস আর প্রত্যয়ই তাঁর মনে এনে দিয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। নেতা আর জনতার সম্মেলনে, সংযোগ, সহযোগিতায় তৈরি পাকিস্তানে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার এই যে ইতিহাস, এ ইতিহাসই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন-ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারা বেয়েই চলেছে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সাধনা। এ সংগ্রাম আর সাধনাই ছিল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন। আজও তিনি এ সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যে বেঁচে আছেন, চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

আজকাল একটা নতুন তত্ত্ব-কথা শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, ধনতন্ত্রের সূতিকাগারে যে গণতন্ত্রের জন্ম, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকটের দিনে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সংকট আজ গণতন্ত্রের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে। এটা সত্য, গণতন্ত্রের জন্য আজ বড় দুঃসময়। গণতন্ত্রের উপর হামলা কেবল এ তাত্ত্বিকদের শিবির থেকেই আসেনি, এসেছে কায়েমী স্বার্থ আর একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত ভৃত্যদের শিবির থেকেও। এ দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব আর সংঘাত যত বাড়ছে, গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত প্রথার প্রতি নয়, নীতির প্রতি আমাদের আস্থাও তত বাড়ছে। আসলে সংকট শুধু আজ একটি শিবিরে নয়, দু'টো শিবিরেই। ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এ দুটো ব্যবস্থাই আজ দ্রুত আবর্তিত -বিবর্তিত-পরিবর্তিত হচ্ছে। ধনতন্ত্র আজ আর সেই আগের ধনতন্ত্র নেই। আর সমাজতন্ত্রেরও পঞ্চাশ বছর আগের সেই চেহারা নেই। দু'টো ব্যবস্থাই দ্রুত আবর্তন-বিবর্তনের মাঝ দিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছে মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এখন বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা ও একচেটিয়া পুঁজির থাবা থেকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা যে একেবারে না হচ্ছে, তা নয়। আবার সোভিয়েট রাশিয়াতেও আজ চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, কিভাবে রাষ্ট্রে অচলায়তন-নিগড় থেকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অন্ততঃ কিছুটা হলেও মুক্ত করা যায়, অর্থাৎ একটির অর্থ গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কল্যাণ, আর একটির লক্ষ্য গণতন্ত্রের রাজনৈতিক মুক্তি। আর এ দুইয়ের সমন্বয়েই আজ দ্বন্দ্বমুখর বিশ্বে প্রকৃত কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এতটা তত্ত্বগত বিচার দ্বারা গণতান্ত্রিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই, কিন্ত তাঁর আজীবনের সাধনা ও কর্ম-প্রবাহ এ কল্যাণ-রাষ্ট্রের চিন্তা ও সংগ্রামেই নিয়োজিত ছিল। জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি কিংবা অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়ন, যে-কোন অজুহাতেই গণতন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এই তত্ত্ব মানতে তিনি অসম্মত ছিলেন। পৃথিবীতে সমাজ ব্যবস্থা বহুবার রূপ পাল্টিয়েছে ; কিন্তু সেই গ্রিক সিটি স্টেটের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রও

www.pathagar.com

তার বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি আছে, অনেক দুর্বলতা আছে, কিন্তু তা মানবিক চরিত্রের দোষ-গুণের মতই। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই দেশে সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র-কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তিনি লৌহ-নিগড়ের শৃঙ্খল বা সকল ত্রুটিমুক্ত অমানবীয় ব্যবস্থার কোনটাই চাননি।

যুগ ও কালজয়ী এই নেতা, তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সাহচর্যে আমাকে ধন্য করেছেন, অভিভূত করেছেন, এ কথা আপনাদের কাছে স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই।এ সাহচর্য আমাকে নতুন যুগ এবং ইতিহাস-চেতনায় উত্তরণ ঘটিয়েছে। গণতন্ত্র ও গণ-অধিকারের প্রতি আপনাদের মত আমারও যে অকুণ্ঠ আস্থা, এ আস্থা ও নির্ভরতার উৎস হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কর্ম-মুখর জীবনের বিপুল ও বিচিত্র ইতিহাস। এ ইতিহাসের যিনি স্রষ্টা তিনি কোনদিন গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়লাভে বিশ্বাস হারাননি; আমাদেরও বিশ্বাস হারাবার কোন কারণ ঘটেনি। ইতিহাসের রথচক্র তার নিজের পথ কেটে এগোবেই। আজকের এ সাময়িক দুর্যোগের দিনকে বরং বলা যায় কালান্তরের ঝড়ো হাওয়া। এর ঝাপটা ও পীড়ন যত প্রবলই হোক, আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ -শোক, নিগ্রহ-নির্যাতন যত তীব্রই হোক, এর থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নীতি ও কর্ম পদ্ধতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। শুধু প্রথাসিদ্ধ স্মরণ নয়, আমরা যদি কর্মে ও বাক্যে সত্য সত্যই এ নীতি ও কর্মপদ্ধতি অকৃত্রিমভাবে অনুসরণ করি, তা-ই হবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের সর্বোত্তম শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর গণতন্ত্র ও গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আরব্ধ কাজ যেদিন বাস্তবায়িত হবে, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর সেই বহুবাঞ্ছিত রূপই হবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ।

১৯৬৭ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। ১৯৬৬ সালের ৫ ডিসেম্বর মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কারাগারে বন্দী ছিলেন। তিনি ৩য় মৃত্যু বার্ষিকীতে যোগদান করতে পারেননি। –সম্পাদক

www.pathagar.com

সমুদ্রের পরিমাপ যেমন সম্ভব নয়

শহীদ সাহেব ইহজগতে নাই-এই কথাই আজ মন বিশ্বাস করতে চাহে না। বিদেশে দেশবাসীর আগোচরে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহাই তার একমাত্র কারণ নয়। আমার মতো এদেশের অগণিত মানুষ আশা পোষণ করত যে, শহীদ সাহেব অন্তত আরও দশ বৎসর বেঁচেই থাকবেন না, কর্মক্ষমও থাকবেন। কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের টানাপোড়েনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুত্থানে গোটা দেশের রাজনীতি যে বিশৃংখলার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং জনসাধারণ তাহাতে যেভাবে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে শহীদ সাহেবের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাই দেশকে উদ্ধার করিতে পারেন–এই ধারণা তাঁহার শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই পোষণ করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে জানিয়াও তাঁহার মৃত্যুর কথা এদেশের মানুষ চিন্তা করিতেও ভরসা পায় নাই। পাকিস্তান আন্দোলনকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগকালে বাংলার জনসাধারণ যেমনি শহীদ সাহেবের কর্মক্ষমতা ও সাহসিকতার উপর অটল আস্থা স্থাপন করিয়া নির্বিঘ্ন থাকিত, জাতির বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণেও তাঁহার প্রতি পাকিস্তানীদের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের একইরূপ আস্থা ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, মন না বুঝিলেও ইহাই রূঢ় সত্য।

শহীদ সাহেবের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া এই বিশেষ সংখ্যায় বিভিন্ন লেখক এবং তাঁহার ভক্ত-অনুরক্তরা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গভীর সমুদ্র সম্পর্কে লেখনীর মাধ্যমে যেমন সব কিছু ফুটাইয়া তোলা সম্ভব হয় না, তেমনি শহীদ সাহেবের চল্লিশ বৎসরের অধিক কর্মময় জীবনের খতিয়ান দেওয়াও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শহীদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ তিনি কাজে বিশ্বাস করিতেন, প্রচারে নয়। জীবনে তিনি যাহা কিছু আয় করিয়াছেন, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে, নিজের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। বরং মৃত্যুকালে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকে ১৩ হাজার টাকা দেনা এবং জিন্নাহ হাসপাতালের বিল বাকি রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকায় যে একখানি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও কন্ট্রাকটরের প্রাপ্য টাকার দায়ে এখনও ভাড়া রহিয়াছে।

কিন্তু তিনি তাঁহার দানের কথা কখনও মুখ খুলিয়া কাহারও নিকট বলেন নাই। এমনকি, যে সকল লোক তাঁহার সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যদি কেহ তাঁহার বিরোধিতা করিতেন তাহা হইলেও তিনি কখনও মুখ খুলিয়া বলেন নাই যে, অমুক লোক আমার নিকট হইতে এতভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আজ আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এই জন্যই তাঁহার অতি নিকটবর্তী লোক ছাড়া অনেকের পক্ষেই শহীদ সাহেবের বিশাল হৃদয়ের প্রকৃত খবর রাখা সম্ভব নয়। সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে তিনি আপন-পর, ভাল-মন্দের প্রশ্ন কখনও বিচার করেন নাই। তাঁহার হাতে অর্থ থাকিলেই সেই অর্থ মানুষকে বিলাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করিতেন। তাই তাঁহার এই উদার মনের কারণে অনেক সময় অপাত্রেও তিনি দান করিয়াছেন। গত বৎসরের একটি ঘটনা। আমি তাঁহার করাচীর বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য বিকালে গমন করি। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম; তিনিই গাড়ির চালক। গাড়িতে উঠিবার পরে তিনি একটি লোককে ডাকিয়া গাড়ির পিছনে বসিতে বলিলেন। ছেলেসহ মাঝারি বয়সের লোকটি জড়সড়ভাবে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ি চালাইতে চালাইতে তিনি বলিলেন, "এই লোকটি বিশেষ অভাবগ্রস্ত। বাল-বাচ্চা নিয়া চরম আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। লোকটি বলে যে, সে দশ হাজার টাকা পাইলে ছোট-খাট কন্ট্রাক্টরের কাজ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি লোকটার পরিচয় জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "কিছুটা চিনি; সে মোহাজের; তবে দেখ না, তাঁহার সঙ্গী ছেলেটির এত সুন্দর চেহারা। অথচ অনুকষ্টে লোকটি কিভাবে কৃশ হইয় পড়িয়াছে এবং সে কতখানি বিমর্ষ।" আমি বুঝিলাম যে, শহীদ সাহেব এই লোকটিকে সাহায্য করিতে চান। কিন্তু লোকটি যাহাতে না বোঝে সে জন্য আমি তাঁহাকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্যার, এই দশ হাজার টাকা নিয়াই কি লোকটি ক্ষান্ত হইবে?" আমি জানিতাম, বহু লোক এইভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলিয়া শহীদ সাহেবের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছে, আবার কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট ধর্না দিয়াছে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিছু দিন পর শহীদ সাহেব ঢাকায় আসিলেন। একদিন তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিলেন, "আমার বহু টাকার দরকার। আমি বড় বড় কেস চাই।" জিজ্ঞাসা করিলাম "হঠাৎ আপনার টাকার এত প্রয়োজন কেন? গতবার করাচী যাওয়ার কালে এখান হইতে যে ২৬ হাজার টাকা নিয়া গিয়াছেন তাহার কি হইল?" তিনি বলিলেন, "ওসব আর নাই। ওখানে কত লোক হা করিয়া থাকে, তোমরা হয়তো তাহা জান না। আমি ব্যাংক হইতে দশ হাজার টাকার ওভার ড্রাফট গ্রহণ করিয়াছি এবং ইনকাম ট্যাক্সের টাকাও বাকি। তাই আমার বহু টাকার প্রয়োজন।" জিজ্ঞাসা করিলাম "স্যার ওই লোকটিকে কি আপনি দশ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং সেই জন্যই কি ব্যাংকের দেনা?" তিনি নীরব রহিলেন। বলিলাম, স্যার, আপনি ওই লোকটিকেই টাকা দিয়েছেন। এইভাবে অসংখ্যা ঘটনা আমাদের চোখে পড়িয়াছে।

যেদিন তাঁহাকে 'এ্যাবডো' করার খবর পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হইল সেদিন একটি মামলা উপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ গমন করিয়াছিলেন এবং বৈকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় তখন টাকার জন্য অপেক্ষা

www.pathagar.com

করিতেছিলেন। হাজার টাকার মত বাড়িভাড়া বাকি পড়িয়াছে। পরিশোধ করিতে না পারিলে বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। আমি এবং মুজিব সাহেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। লোকটি টাকার কথা বলিতেই আমরা একপ্রকার চটিয়া গেলাম। কারণ, সেদিন তাঁহার মন খারাপ থাকিবার কথা। কিন্তু 'এ্যাবডোর' মত অপমানজনক, অত্যাচারমূলক ব্যাপারকেও তিনি সেদিন হাসিমুখে গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তিনি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহারই গচ্ছিত টাকা আনিয়া লোকটিকে দিয়া দিলেন।

মানুষ বড় হইলে সাধারণত গরিব আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দেয় না। কিন্তু শহীদ সাহেবের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি গরিব আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। তাহাদের ভাঙ্গাচুরা ঘরে গমন করিতে কিংবা তাহাদের সহিত খানাপিনা করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। বরং অনেক সময় তাহাদের দুরবস্থা লইয়া আমাদের সহিতও আলাপ করিতেন এবং প্রচুর পরিমাণ সাহায্য করিতেন। ১৯৬১ সালের একটি ঘটনা। শহীদ সাহেবের এক খালাত বোন কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করেন। শহীদ সাহেবের বড় ভাই শাহেদ সাহেবও তখন ঢাকায়। তিনি তাঁহার বোনকে বলিলেন দেখ, বড় ভাইয়ের কাছে কোন সাহায্য চাহিবে না। যা পারি আমিই দিব। এই সময় তিনি স্বাস্থ্যের কারণে হাওয়া পরিবর্তন এবং চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গমন করিতেছিলেন। আমার স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত তাঁহার সকল টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। গাড়িতে উঠিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে বাথরুমের মধ্যে ডাকিয়া নিয়া মানিব্যাগ হইতে ১৬ শত টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন ঃ দেখ, আমি বিদেশে যাইতেছি। সেইজন্য টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার যদি কোন ঠেকা হয়, সেইজন্য এই সামান্য টাকা রাখিয়া গেলাম। আমি প্রথমে টাকা নিতে অস্বীকার করিলাম। বলিলাম ঃ বর্তমানে টাকার আমার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমি টাকা গ্রহণ করিলাম এই ভাবিয়া, যাহাতে তাঁহার মনে এই ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, অল্প টাকা বলিয়া আমি গ্রহণ করিতেছি না। তিনি একাধিকবার একটি রেফ্রিজারেটরের প্রয়োজনের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি এই সুযোগে শহীদ সাহেবের প্রদত্ত টাকার সহিত আরও কিছু টাকা যোগ করিয়া একটি রেফ্রিজারেটর কিনিয়া ফেলিলাম। শহীদ সাহেব চলিয়া যাইবার পর বৈকালে আমার স্ত্রী শহীদ সাহেবের বোনের ঠিকানা জানিতে চাহিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? সে বলিতে চাহিল না। পরবর্তী কালে জানা গেল যে, শহীদ সাহেব তাহার জন্য পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কথা কাহারও নিকট বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা গত চারিটি বৎসর আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। টাকাকে তিনি টাকা গণ্য করেন নাই। টাকার দ্বারা যদি মানুষের এতটুকু কল্যাণ বিধান করা যায়, ইহাই ছিল তাঁহার নিকট টাকার সার্থকতা। কলিকাতা

www.pathagar.com

থাকিতেও তাঁহার কাজের ধরন একই ছিল। প্রতি মাসের প্রথম দিকে দেখা যাইত তাঁহার বাড়িতে বহু 'অজানা-অচেনা' লোকের ভীড়। তিনি তাহাদেরকে একে একে তাঁহার কামরায় ডাকিয়া পাঠাইতেন। পরে জানা যাইত যে, তিনি এই সকল লোককে মাসিক সাহায্য প্রদান করিতেন। ইহার মধ্যে ছিল সাধারণত গরিব ছাত্র, বস্তি এলাকার দুস্থ লোকজন। কলিকাতার মুসলিম বস্তি এলাকাগুলিতে তিনি নেজই ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিতেন। তাহাদের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন ও ডাক্তারের টাকা পরিশেধ করিতেন। এক কথায় সাধারণ মানুষের আপদে-বিপদে তিনি সর্বদাই তাহাদের পাশে দাঁড়াইতেন।

কলিকাতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'রাজনৈতিক দুর্গ' বলিয়া পরিচিত ছিল তাঁহার চেহারা দেখিয়া নয়, মানুষের প্রতি দরদ এবং সেবাকার্যের জন্যই। শহীদ সাহেব অভিজাত বংশের লোক হইয়াও কলিকাতার বস্তি এলাকার লোকজনের সহিত রাস্তার পার্শ্বে টুলে বসিয়া চা ইত্যাদি পান করিতেন। লোক দেখাইবার জন্য নয়, তাহাদেরকে সংগঠিত করার জন্য এবং তাহাদের আত্মমর্যাদা সৃষ্টির কারণে। কলিকাতার মানুষ যে তাঁহার কথায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিত তাহার মূল কারণও ছিল এখানেই।

তাঁহার যোগ্যতা এবং গুণাবলীর জন্য শিক্ষিত সমাজের যেমনি তিনি আদরণীয় ছিলেন, তেমনি তাঁহার নীরব সেবা এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদের কারণেই তিনি ১৯৩৭ সালের এবং ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কলিকাতা এবং ২৪ পরগণার দুই-দুইটি আসন হইতে একরূপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। শেরে বাংলা এক, কে, ফজলুল হক ছাড়া পাক-ভারত উপমহাদেশের কোন মুসলিম রাজনীতিকের পক্ষে এইরূপ জয়লাভ সম্ভব ছিল না।

দেশবাসী তাঁহার উপর যেরূপ আস্থা রাখিতেন, তিনিও দেশবাসীর উপর একই রূপ আস্থা এবং দরদ পোষণ করিতেন। কায়েমীস্বার্থের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা যখন বিভক্ত হয় তখন তিনি অন্তত কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের শামিল রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল যে, রাজধানী কলিকাতা পূর্ব বাংলার সম্পদ দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যেহেতু বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় বাংলা বিভাগ চায় না, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই বাংলা বিভাগের দাবি করিতেছে, সেইহেতু, রাষ্ট্রীয় কানুনের বিধানমতেও সংখ্যালঘিষ্ঠ বিচ্ছিন্ন (Seceding) অংশ রাজধানী পাইবার অধিকারী নয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্নর মিঃ বারোজকেও তিনি এই যুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যকারই একদল লোক সূক্ষ্মপথে ইহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা বলিতে শুরু করেন যে, কলিকাতার কোন ভবিষ্যৎ নাই। বাঙালি মুসলমানরা এখান হইতে চলিয়া গেলে এবং চট্টগ্রাম পোর্ট সম্প্রসারিত হইলে কলিকাতার কোন বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি থাকিবে না; কলিকাতার গুরুত্ব নষ্ট হইবে এবং কলিকাতায় এমনি সমস্যা দেখা দিবে যাতে কলিকাতা শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

পাতিশিয়ালের বাসস্থানে পরিণত হইবে। তাহারা আরও গোপন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, নিজস্ব স্বার্থের জন্যই শহীদ সাহেব কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে চাহেন। কিন্তু দুনিয়া জানিত যে, কলিকাতায় বা পশ্চিম বঙ্গে শহীদ সাহেবের নিজস্ব স্বার্থ বলিয়া কিছু ছিল না। কলিকাতায় তাঁহার কিংবা তাঁহার বংশের কাহারও একখানা নিজস্ব বাড়িও ছিল না। ৩ নম্বর ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেন কিংবা ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে তাঁহার বাসস্থানটি ভাড়া করা বাড়ি ছিল। কলিকাতার প্রতি তাঁহার দরদের দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, ইহা প্রধানত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও সম্পদ দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সংখ্যালঘুদের বাংলা বিভাগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইনত ও রাজধানীর উপর তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কলিকাতার মুসলমানেরাই অগ্রভাগে ছিলেন বা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় তাহাতে কলিকাতার মুসলমানদেরই অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি পোহাইতে হয় এবং জীবন আত্মাহুতি দিতে হয়। এই কারণেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট তাহারা স্বাভাবিকভাবেই দুশমনে পরিণত হয়। শহীদ সাহেবের এই দরদ যে মেকী ছিল না, তার প্রমাণ শেষ পর্যন্ত কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তিনি অন্যদের মত পাকিস্তানে ছুটিয়া না আসিয়া দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর সহিত শান্তি-মিশনে অবতীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার জীবনের উপর কতবার আক্রমণ চলিয়াছিল তাহা অনেকেরই জানা আছে। একদা রাত্রে বেলিয়াঘাটা গান্ধী ক্যাম্পে গমনকালে বেলিয়াঘাটা পুলের উপর তাঁহার গাড়ির প্রতি একটি তাজা বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমার আঘাতে তাঁহার গাড়ির হুডটি উড়িয়া যায়। কিন্তু খোদার অসীম অনুগ্রহে আশ্চর্যজনকভাবে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। তাঁহার জীবনের উপর এই ধরনের আক্রমণের পরেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়ান নাই কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। শুধু কলিকাতাতেই নয়; দিল্লী পাতিয়ালা, নাভা, কর্পূরতলা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতেও তিনি গান্ধীজীর সহিত গমন করেন। উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যে আটদফা কর্মসূচি রচনা করেন, তৎকালীন উত্তেজনার মুহূর্তে তাহা গৃহীত না হইলেও ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত প্যাকটে তার অনেকগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। তফাত এই, বিলম্বিত ব্যবস্থা বাঞ্ছিত ফললাভে সক্ষম হয় না। তিনি যখন ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষত কলিকাতার মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার পবিত্র ব্রত নিয়া ব্যস্ত ছিলেন তখন কায়েদে আজম বা মরহুম লিয়াকত আলী তাঁহাকে পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

ইহাতে তাঁহার সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকমহল ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কিন্তু তাঁহার মনোভাব ছিল অতি পরিষ্কার। সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোন পদের পরোয়া করিতেন না। তাহা ছাড়াও গান্ধীজীর সহিত শান্তি-মিশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়, তখন তিনি গান্ধীজীর অনুরোধে এই ওয়াদা প্রদান করিয়াছিলেন যে, শান্তি-মিশন সম্পূর্ণভাবে সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি অন্য কোথাও গমন করিবেন না। শান্তি-মিশনে কোন আমোদ-প্রমোদ কিংবা নেতৃত্বের প্রশ্ন ছিল না। দিল্লীর বিড়লা হাউসে অবস্থানকালে শহীদ সাহেবের জীবন নাশের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, গান্ধী হত্যাকারী গডসের মামলায় তাহা প্রকাশ পায়। তাদের ধারণা ছিল যে, শহীদ সাহেবই গান্ধীজীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে হিন্দু স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করাইয়াছেন। অতএব, শহীদ সাহেবকে হত্যা করাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও গান্ধীজীর নিকট প্রদত্ত ওয়াদা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। গান্ধীজীর জীবনকাল পর্যন্ত তিনি শান্তি-মিশনের কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি পাকিস্তানে আগমন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাকিস্তানের শাসনকর্তারা শহীদ সাহেবের গণপরিষদের আসনটি কাড়িয়া নিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পাকিস্তানে আগমনের পর তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য গোটা শাসনযন্ত্র এবং দেশের সংবাদপত্রকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। তাঁহাকে 'ভারতের দালাল', 'পাকিস্তানের দুশমন' প্রমাণিত করিবার জন্য শাসকশ্রেণীর অপপ্রয়াসের অভাব ছিল না। তিনি নীরবে সব কিছু সহ্য করিয়াছেন এবং হাজার প্রতিবন্ধকতার মুখেও বিরোধী দল গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পাকিস্তানকে একটি 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন অপরিহার্য। তাঁহার বিরুদ্ধে 'যুক্ত বাংলার' অভিযোগ আনয়ন হইতে শুরু করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সভা-সমিতি এবং সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করিলেও তাঁহার বক্তৃতা-বিবৃতিতে কোথাও ব্যক্তি-বিদ্বেষ বা গালাগালি অথবা অপরের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এত অপপ্রচার সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি মানুষের আস্থা কখনও শিথিল করা সম্ভব হয় নাই। ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান সান্ত্বনা।

প্রসঙ্গত যাহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া গেলে কলিকাতার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে, কলিকাতা একপ্রকার জনমানবশূন্য হইয়া যাইবে, তাঁহাদের আজ কলিকাতায় গিয়া দেখা উচিত, কলিকাতার জনসংখ্যা আজ কি পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (প্রায় এক কোটি)। কলিকাতা আজ ব্যবসায়-বাণিজ্যে-শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের আয়ের অর্ধেক না হইলেও প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি যোগায় বৃহত্তর কলিকাতা। পাকিস্তানের রাজনীতিতে

www.pathagar.com

গোড়া হইতেই যে দূরদর্শিতার অভাব এবং সুযোগসন্ধানী নীতি লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহারই পরিণতি হিসাবে পাকিস্তান বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কলিকাতা হারানো বাবদ ক্ষতিপূরণও আদায় করা সম্ভব হয় নাই। সুবিধাবাদী রাজনীতির সেই জের অধিকতর কদর্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচনের প্রশ্নেও একই পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল। পরিষদ সদস্যদের ভোটে নেতা নির্বাচিত হইবেন; তাঁহারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি। অতএব নেতা নির্বাচনের প্রশ্নে তাঁহাদেরকে টানাটানি করিবার এমনকি ক্যানভাস করিবার প্রয়োজনীয়তাও শহীদ সাহেব বোধ করিতেন না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে একদল পরিষদ সদস্য মন্ত্রিত্ব, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং বিভিন্ন পদ লইয়া দর কষাকষি শুরু করেন। ষোল সদস্য বিশিষ্ট সিলেট গ্রুপ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি তৎপর ছিল। তাহারা অন্তত দুইটি মন্ত্রিত্ব, স্পীকারশীপ এবং কয়েকটি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী পদ দাবি করিলেন। শহীদ সাহেব তাঁহাদের স্পষ্ট 'না' জবাব দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কাহাকেও এই-প্রকার ওয়াদা দিতে পারিব না। তবে এতটুকু বলিতে পারি যে, সিলেট যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, মন্ত্রিসভায় তাহাদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।" ইহার অধিক আর কিছু বলিতে তিনি সম্মত হইলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া মরহুম মোহাম্মদ আলী, খাজা নসরুল্লাহ এবং ডাক্তার মালেক শহীদ সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে, অন্তত তাঁহারা যেসব পদে অধিষ্ঠিত আছেন–এই পদগুলি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়া নেতা নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শহীদ সাহেব ইহাতেও অসম্মত হইলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, পাকিস্তান একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হইতে চলিয়াছে; সেখানে শুরুতেই এই ধরনের পদ বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া পারিতোষিক বিতরণের রাজনীতি শুরু করা হইলে দেশে সৎ রাজনীতির মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। তাই নেতা নির্বাচনের পূর্বদিন রাত্রে হোটেল বিল্টমোর হইতে সিলেটের পরিষদ সদস্যদের অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে দেখা গেল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই নেতা নির্বাচনের মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। পরাজিত হইবার পরে শহীদ সাহেবকে এক মুহূর্তের জন্যও বিমর্ষ হইতে দেখি নাই। কিন্তু আজ দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, শহীদ সাহেব যদি তখন পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচিত হইতেন, তাহা হইলে দেশের সমাজব্যবস্থার কতদূর কি হইত জানি না, তবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কারণ, তিনি শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলেন নাই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে কার্যক্ষেত্রেও তাহা পরিণত করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া তিনি বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান করেন। এমনকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও মুক্তি দেন।

পার্লামেন্টে নিজের ক্ষুদ্র দল লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায়ও যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হইলেন তখনও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁদের দলের ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা

www.pathagar.com

পর্যন্ত কাহাকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় নাই। এশিয়া-আফ্রিকার অপর কোন দেশে ইহার নজির নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই যদি এই নীতি পূর্ব পাকিস্তানে অনুসরণ করা হইত তবে পশ্চিম পাকিস্তানেও যে শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত এবং গোটা রাজনীতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া সুষ্ঠু রূপ পরিগ্রহ করিত, এইরূপ ধারণা পোষণ করা কল্পনাবিলাস নয়।

১৯৪৫ সালের জুন মাস। বাংলাদেশে ৯৩ ধারার গভর্নর শাসন চলিতেছে। নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক গঠিত আই,এন, এ, বাহিনীর বিচার শেষ হইয়াছে। ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে সাত বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস ফরোয়ার্ড ব্লক, এমনকি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পরিচালিত হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করিয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা অনুষ্ঠানের পর বিরাট গণমিছিল বাহির করা হইয়াছে। এসপ্ল্যানেড ও ধর্মতলার মোড়ে পুলিশ মিছিল আটক করিয়াছে। এসপ্ল্যানেড ও ডালহৌসী স্কোয়ার সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। মিছিলকারীরা বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সংরক্ষিত অঞ্চলে গমন করিতে বদ্ধপরিকর। পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি চলিতেছে। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ না হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। এই খবর মুসলিম লীগ মহলে পৌঁছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আই,এন,এ'র অভিযুক্তদের মধ্যে একমাত্র রশিদ আলীই মুসলিম লীগের নিকট তাঁহার পক্ষ সমর্থনের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; মেজর শাহ নওয়াজসহ অন্য আই,এন,এ বন্দীরা কংগ্রেসকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের অনুরোধ জানান। স্পেশাল কোর্টে মুসলিম লীগ রশিদ আলীর পক্ষ সমর্থন করে বটে; কিন্তু তাঁহাকে শাস্তি প্রদানের পর তাঁহার মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এই কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগও নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু ইত্যবসরে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল কলিকাতায় আই,এন,এ, দিবস ঘোষণা করে। যাই হউক, ধর্মতলার মিছিলের খবর পাইয়া লীগ মহল সক্রিয় হইয়া ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লীগ নেতৃবৃন্দ তিন নম্বর ওয়েলেসলী ফার্স্টলেনে অফিসের ছাদে পরামর্শ সভায় মিলিত হন। জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম সাহেব মিছিলে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা যুক্তি দেখান যে, এই আন্দোলনে মুসলিম লীগেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। কারণ, রশিদ আলী মুসলিম লীগ হাই কম্যান্ডের নিকট তাঁহার পক্ষ সমর্থনের অনুরোধ জানান। তাঁহারা আরো যুক্তি দেখান যে, এই আন্দোলনে মুসলিম লীগ যোগদান করিলে পাকিস্তান ইস্যুর উপর যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে তাহাতে মুসলিম লীগের জনসমর্থন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মুসলিম লীগের উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মিছিল পরিচালনায় রাজি হইলেন না। অতঃপর জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম সাহেব সদলবলে এই আন্দোলনে

www.pathagar.com

যোগদান করিলেন। এই প্রথমবার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মিলিতভাবে মিছিল পরিচালনায় আগাইয়া আসিলেন। এই খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মহানগরীতে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। মিছিলের পুরোভাগে রহিয়াছেন শহীদ সাহেব, হাশিম সাহেব, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ নেতা। কার সাধ্য এই মিলিত শক্তিকে তখন বাধা দেয়? দেখিতে দেখিতে অগণিত মানুষের মিছিল সংরক্ষিত এলাকা অতিক্রম করিয়া চলিল। মহানগরীর এখানে-ওখানে সাদা চামড়ার উপর আক্রমণ শুরু হইল। পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্য শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হইল। তিনি লালবাজার কন্ট্রোল রুমে গমন করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার লালবাজার গমন উপলক্ষ করিয়া গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, শহীদ সাহেবকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই খবর ছড়াইয়া পড়িতেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পার্ক-সার্কাস, কলুটোলা, জাকারিয়া স্ট্রীট, রাজাবাজার , চান্দনী চক, এমনকি খিদিরপুর পর্যন্ত পুলিশ এবং শ্বেতকায় নারী-পুরুষের উপর আক্রমণ চলিল। শহরের বহু স্থানে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হইল। শহীদ সাহেবকে সশরীরে সম্মুখে দেখিবার পরেই বিভিন্ন অঞ্চলে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। এই আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়িয়া ওঠে। তাঁহারা প্রমাদ গনিতে লাগিলেন। তারপর বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের চূড়ান্তভাবে ঘাবড়াইয়া তুলিল। রাজনৈতিক পর্যালোচকদের ধারণা যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে এক বিশেষ শক্তির হাত ছিল। এই সময় কলিকাতার মুসলমানদের কিংবা মুসলিম নেতৃবৃন্দের আদৌ দাঙ্গা বাধাইবার যে কোন অভিপ্রায় ছিল না, তার প্রমাণ উক্ত দিবসে শিশু-সন্তান নিয়া মুসলমানেরা দলে দলে ময়দানে প্রতিবাদ সভায় যোগদান করিয়াছিল। দাঙ্গা বাধাইবার যদি তাহাদের পরিকল্পনা থাকিত তাহা হইলে ঘরে পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় রাখিয়া তাহারা মাঠে গমন করিত না। দাঙ্গা চলার কালে শহীদ সাহেব এবং মুসলিম লীগের উপর যতই অপবাদ দেওয়া হউক না কেন, দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, ১৬ই আগস্ট দাঙ্গার শুরু হইতেই শহীদ সাহেব পুলিশ হেড কোয়ার্টার লালবাজার গমন করিয়া পরিস্থিতির ভয়াবহতা জ্ঞাত হইবার পরক্ষণেই সামরিক বাহিনী তলব করেন। কলিকাতায় তখন সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ শতের মত এবং কলিকাতা মহানগরীর জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষের উপর। তাই ১২ শত সশস্ত্র পুলিশ ব্যাপক দাঙ্গার ক্ষেত্রে যে আদৌ কোন কাজে আসিতে পারে না তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি সামরিক বাহিনী তলব করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি সামরিক বাহিনী তলবের অধিকার ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দাঙ্গার তিন দিন পরে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করেন। দাঙ্গা কমিশনের সম্মুখে হেডকোয়ার্টারের ভারপ্রাপ্ত তদানীন্তন

www.pathagar.com

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ নর্টন জোন্‌স যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাতে তিনি অস্বীকার করেন যে, দাঙ্গার প্রথম দিনেই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সামরিক বাহিনী তলব করার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনদিন ব্যাপক দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা চরমে পৌঁছে। ইংরেজদের তৎকালীন মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' শিরোনামায় সম্পাদকীয় ফাঁদিয়া হিন্দু-মুসিলম বিরোধ তীব্রতর করিয়া তোলে। রশিদ আলী দিবসের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ধূলিসাৎ হইল; ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইল।

শহীদ সাহেব নিজের সাফল্য কিংবা কার্যক্রম সম্পর্কে নিজে কখনও গর্বোক্তি করিতেন না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইল। তিনি দেখিলেন যে, কলিকাতার ১২ শত সশস্ত্র পুলিশের মাত্র ৬৩ জন মুসলমান এবং কলিকাতার একজন ডি,সি এবং একটি থানায় একজন মুসলমান অফিসার ছাড়া বাকী সকল অমুসলমান। সাম্প্রদায়িকতা তখন দেশে এমনি ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে সরকারি কর্মচারীরাও আর সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নাই। এই অবস্থায় তিনি পাঞ্জাব হইতে ১২ শত ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিপাহী সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ করিয়া সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বিরোধীদলীয় লোকেরা উহাতে বাধা প্রদান করিলেন; এবং গভর্নরের নিকট পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাইলেন। গভর্নর প্রথমত এই পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু শহীদ সাহেব ইহাতে সম্মত না হওয়ায় গভর্নর বাঙালি সিপাহী নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলিলেন যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক বাঙালির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাঁহার এক্ষণেই প্রয়োজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকের। তারপর তিনি বলিলেন যে, কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীতে বাঙালি হিন্দুও নাই; রহিয়াছে গুর্খা, রাজপুত, শিখ এবং জাঠ। তাহাদের বরখাস্ত করিয়া সমসংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি তাতে সম্মত আছেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর তাতে রাজি হইলেন না এবং পাঞ্জাবী ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিপাহী নিযুক্ত না করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। এই ইস্যুর উপর পদত্যাগ করিবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিবার পরই গভর্নর বারোজ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় ২২টি থানায় ২১টিতে মুসলমান অফিসার-ইন-চার্জ নিযুক্ত করিলেন এবং কন্ট্রোল রুমের চার্জে একজন মুসলমান ডি,সি, নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আয়ত্তে আসিল এবং পরিস্থিতি শান্ত হইল। মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলা সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না। কলিকাতার মুসলমানরা সংখ্যালঘু— এই কারণেই সংখ্যালঘু অধিবাসীর নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে এবং যুক্তিতে তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ কর্মী এবং নেতাদের অনেকের

www.pathagar.com

প্রতিবাদ সত্ত্বেও নোয়াখালীতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে তিনি গান্ধীজীকে নোয়াখালী সফর এবং তথায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান এবং সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি একশ্রেণীর অদূরদর্শী মুসলিম লীগারদের নিকট যথেষ্ট অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। নোয়াখালীতে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। তাই যেই ব্যবস্থায় তাহারা নিরাপদ বোধ করে তাহা গ্রহণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। কলিকাতার দাঙ্গাকালে তিনি কিভাবে বারে বারে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন তাহাও সকলের জানা আছে। দেশ বিভাগের পরেও তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তুলিবার-বিশেষত উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়াও এবং কোন কোন মহলে ভুল ধারণার সৃষ্টি ও তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ঘটিতে পারে জানিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অথচ আজ ভারতের সহিত যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িবার কেহ প্রস্তাব দিলেও তাহা 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হয় না। সেখানে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের সুপারিশ করিয়া সেদিন তিনি পাকিস্তানের একশ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের নিকট হইতে 'ভারতের এজেন্ট', 'ভারতের কুকুর' এবং 'যুক্তবাংলার ষড়যন্ত্রকারী' বলিয়া কত অপবাদ কুড়াইয়াছেন! কিন্তু এই ধরনের কুৎসা রটনা বা গালাগালিতেও তিনি কোন দিন লক্ষ্যভষ্ট হন নাই কিংবা ধৈর্য হারাইয়া আক্রমণকারীকে অশোভন ভাষায় প্রতিআক্রমণ করেন নাই। রাজনৈতিক জীবনে আগাগোড়া তিনি এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া বিরোধী দলীয় হিন্দু সদস্যরা এবং সংবাদপত্রগুলি যখন তাঁহার প্রতি চরম আক্রমণ চালান, তখনও তিনি যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা তাঁহাদের অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন; প্রতিআক্রমণ দ্বারা নয়। মরহুম লিয়াকত আলী ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট বেতার ভাষণে তাঁহাকে তীব্র ও অশোভন ভাষায় আক্রমণ করিলেও তিনি যে সংযম এবং বিনয়ের সহিত তার জবাব প্রদান করিয়াছিলেন, দেশবাসীর আজও তাহা স্মরণ আছে। প্রতিপক্ষ তাঁহার সম্পর্কে যতই অপপ্রচার করুক না কেন, তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি মানুষের অন্তরে যে গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জীবনে অসংখ্য বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কখনও ভাবালুতার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই কিংবা তিনি যাহা করিতে পারবেন না, এইরূপ ওয়াদা কখনও করেন নাই। আজ তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতি ঘাঁটিয়াও কেহই দেখাইতে পারিবেন না যে, তিনি বিরোধী দলে থাকাকালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার খেলাফ করিয়াছেন। রাষ্ট্র চালনায় অভিজ্ঞতা এবং সুরাজনীতিবিদ সুলভ নীতিজ্ঞান থাকার দরুনই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেও আবোল-তাবোল কথা কিংবা অবাস্তব প্রতিশ্রুতি কখনও দেন নাই। এই ব্যাপারে আমাদের দেশের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে। রাজনীতিতে 'রুল অব গেইম' পালন করা না হইলে এবং সহনশীলতার মনোভাব না থাকিলে গণতন্ত্র বিকশিত হইতে এবং শিকড় গাড়িতে পারে না, ইহাই ছিল শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন এবং ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার অর্থ জনগণের তরফ হইতে রাষ্ট্র চালনার ম্যানেজারি করা। যে পর্যন্ত জনগণের কল্যাণ বিধান করা যায় এবং যে পর্যন্ত জনসমর্থন থাকে সেই পর্যন্ত ব্যক্তি বা দলবিশেষের ক্ষমতায় থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। জনগণ যদি ভুল করিয়াও কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তাহা হইলে ক্ষমতা হইতে সরিয়া দাঁড়ানোই একমাত্র পথ। তাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পরে তিনি দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে যতগুলি উপনির্বাচন অবশিষ্ট ছিল সেগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক শক্তি ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁদের কারসাজিতে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হইল না এবং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে বিদায় নিতে হইল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং গণভোট কিংবা সাধারণ নির্বাচনের মারফতে দেশবাসীর মতামত যাচাই করাই ছিল তাঁহার প্রধান দাবি ও লক্ষ্য। জেল হইতে বাহির হইবার পরে তিনি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক অভূতপূর্ব জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আজও সেগুলির ধ্বনি কানে বাজে। তিনি বলিয়াছিলেন, জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহাদের হাতে পুলিশ আছে, সরকারি শাসনযন্ত্র আছে, অনুগ্রহ বিতরণের সুযোগ-সুবিধা আছে, আরও আছে অর্থ। পক্ষান্তরে, আমাদের অর্থ নাই, কাউকে কিছু দিবারও নাই। জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু আপনাদের নিকট একটি অস্ত্র আছে-সেইটি হইল ঐক্য। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকিলে দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদের দাবি না মানিয়া পারিবে না। অবশ্য এই ঐক্য নিষ্ক্রিয়তার ঐক্য নয়; কাজের জন্য ঐক্য চাই।

ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬৪

www.pathagar.com

লুমুম্বার হত্যা ও কঙ্গো পরিস্থিতি

লুমুম্বার হত্যা ও কঙ্গো পরিস্থিতি উপলক্ষ করিয়া জাতিসংঘের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটিবে, তাহা এখনও বলা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন মহল হইতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে যে, জাতিসংঘ বর্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকারাচ্ছন্নই নহে, ইহার ফলে জাতিসংঘ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। লক্ষণও সেইরূপই দেখা যাইতেছে। রাশিয়া সরকারিভাবে সেক্রেটারি জেনারেল দাগ হ্যামারশোল্ডের অপসারণ দাবি করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, রুশ সরকার কোনক্রমেই দাগ হ্যামারশোল্ডকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে স্বীকার করিবেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডী দাগ হ্যামারশোল্ডকে সমর্থন দিয়াছেন এবং কাশাভুবুকে কঙ্গোর আইনানুগ রাষ্ট্রনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, রাশিয়া বা আমেরিকা তাহাদের এই ঘোষিত নীতি হইতে পশ্চাদপসরণ না করিলে অথবা উভয়ের গ্রহণযোগ্য কোন আপোস-ফর্মুলা উদ্ভাবন করা না গেলে জাতিসংঘে ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

রাশিয়া এবং আমেরিকা যে পরস্পরবিরোধী ভূমিকা বা কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তার গুণাগুণ বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার স্থগিত রাখিয়াও বলা চলে যে, কঙ্গোর উদ্ভূত পরিস্থিতি এই পথে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না। রাশিয়ার তরফ হইতে যে দাবিগুলি উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার সবগুলি বাস্তবধর্মী না হইলেও উহাতে এশিয়া-আফ্রিকা বিশেষ করিয়া কঙ্গোবাসীদের ভাবধারা ও সেন্টিমেন্ট নিপুণতার সহিত তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কাশাভুবু-শোম্বে-মবুতু-চক্র লুমুম্বার হত্যার জন্য দায়ী হইলেও তাহাদের গ্রেফতার এবং শাস্তিবিধানের ব্যাপারে জাতিসংঘের আইনগত অধিকার আছে কিনা, সে সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়াছে। কিন্তু সেক্রেটারি জেনারেলের অপসারণ, কঙ্গোর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রদান, কাশাভুবু ও শোম্বেকে ক্ষমতা হইতে অপসারণ এবং জাতীয় পার্লামেন্ট আহ্বান করত পার্লামেন্টের অভিমত অনুসারে সরকার গঠন ইত্যাদি দাবি অতি সঙ্গত এবং কঙ্গো সমস্যা সমাধানের -বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনে ইহা প্রকৃষ্ট পথ বলিয়াই অনেকের নিকট মনে হইবে। পক্ষান্তরে, প্রেসিডেন্ট কেনেডী সাংবাদিক সম্মেলনে যে মত, পথ ও নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একতরফা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অবশ্য এই কথা আমরা স্বীকার করি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব হইতে যে সকল সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কেনেডীর পক্ষে ভিন্নতর ভূমিকা

www.pathagar.com

গ্রহণের অবকাশ খুব কমই। তবে ইহা আলাদা ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি অসুবিধা রহিয়াছে, কিভাবে তাহারা নানা সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের বিবেচ্য বিষয় নহে। তাহারা চায় উদ্ভূত সমস্যার গণতন্ত্রসম্মত সমাধান। রাশিয়ার কোন ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল, 'স্বাধীন দুনিয়ার' স্বার্থ তথা মার্কিন স্বার্থ রক্ষার্থে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তার সহিত কঙ্গো সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। অন্তত তাহা লইয়া মানুষ আজ মাথা ঘামায় না। কে তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দেয় তাহারা সেই দিকেই লক্ষ রাখে। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আলোচ্য বিবৃতি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার পূর্ববর্তী সরকার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে কতকগুলি জটিল সমস্যা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য কেনেডীকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু এই গোড়ার ভুল যদি চলিতে থাকে তাহা হইলেও কেনেডী সরকারের আবির্ভাবে মানুষের মনে যে নতুন আশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অদূর ভবিষ্যতে নির্বাপিত হইবে।

মিঃ কেনেডী তাঁহার বিবৃতিতে দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির ভাবধারা এবং স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়াছেন। আবার অপরদিকে এশিয়া-আফ্রিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন জাতি বা মানুষের পক্ষে এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় বিধান সম্ভব নহে। তাই আমরা লক্ষ রাখিয়াছি যে, মিঃ কেনেডী মিঃ কাশাভুবুকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সমর্থন করিতে গিয়া আইনসম্মত কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জাতিসংঘের ভোটাভুটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কঙ্গোর সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পার্লামেন্টকে কেন বেআইনীভাবে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিভাবে পার্লামেন্টের আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে অপসারণ করা হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। জাতিসংঘের ভোটাভুটি সাধারণত ব্লক-ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহা ছাড়াও কঙ্গোর সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে তাহার জাতীয় পার্লামেন্টই ছিল সর্বপ্রধান এবং এই ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের কোন এখতিয়ার ছিল না। মিঃ কেনেডী কেন এই প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিতে বেশ ভাবনাচিন্তা করিতে হয় না। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন রহিয়াছে। যে সকল ঔপনিবেশিক শক্তি কঙ্গোতে অঘটন ঘটাইয়াছে এবং কঙ্গোর স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছে, তাহারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোটের সদস্য। এই প্রতিরক্ষা জোট কেনেডীর আমলে গঠিত না হইলেও তিনি এক তুড়িতে ইহা উড়াইয়া দিতে পারেন না বা তাহাদের অসন্তুষ্টও করিতে পারেন না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে মিঃ কেনেডীর পক্ষে 'ডুডও খাব টামাকও খাব' এই নীতি অনুসরণ করা চলে না। কারণ ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে কোন মাঝ পথ নাই এবং সেইহেতু উভয়কে সন্তুষ্ট রাখিবারও কোন উপায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা শক্তি-ব্লক এইরূপ সমন্বয় ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাইতে গিয়া এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ— কেহ-বা নিরপেক্ষ রহিয়াছে এবং কেহ-বা স্বাধীন দুনিয়া হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

মিঃ কেনেডী কঙ্গোর প্রশ্নে যে 'আইন'-এর কথা তুলিয়াছেন, সেই ধরনের আইনের উপর নির্ভর করিবার ফলেই ৬৫ কোটি মানুষ অধ্যুষিত মহাচীন কম্যুনিস্ট কবলে চলিয়া গিয়াছে। সেই আইন ইন্দোচীন, কোরিয়াকে বিভক্ত করিয়াছে এবং এই দেশগুলিতে ও লাওসে কম্যুনিস্টদের শুধু ঘাঁটি স্থাপনই নহে, প্রচুর প্রভাব বিস্তারেও সাহায্য করিয়াছে। সেই আইন আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশকে পশ্চিমা শক্তিবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। সেই আইন কাসাব্লাঙ্কা শক্তিগুলিকে কঙ্গোর স্ট্যানলিভিলস্থ গিজেঙ্গা সরকারকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করিতেছে। যে-আইন মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারকে বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেই আইনের পরিণতি ইহা অপেক্ষা উন্নতর হইতে পারে কি? চোখের সামনে এইসব ঘটনা এবং পরিণতি লক্ষ করিয়াও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পূর্বতন নীতিতে অবিচল থাকে, তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তনের, বিশেষ করিয়া এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক উন্নত করিবার আশা কোথায়?

জতিসংঘের ভবিষ্যৎ কী, তাহা সঠিকভাবে বলা না গেলেও আমরা যে লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আমাদের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন না হইলে রাশিয়ান ব্লক জাতিসংঘ হইতে বাহির হইয়া যাইবে। কিউবা, ঘানা, গিনি, মরক্কো, ইরাক, আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালি প্রভৃতি ভিন্ন জোট গঠন করিবে অথবা কম্যুনিস্ট ব্লকের সহিত মিলিয়া একটা পাল্টা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিবে। ইহার পর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে সকল দেশ পশ্চিমী শক্তি অধ্যুষিত জাতিসংঘে থাকিবে তাহারা পশ্চিমা ব্লকের উপর অধিকতর চাপ দিতে বাধ্য হইবে এবং শেষ পরিণতিতে অর্থাৎ জনমতের চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাহারাও একে একে পুরাতন জাতিসংঘ ত্যাগ করিবে এবং শেষ পর্যন্ত উহা পশ্চিমী শক্তি ব্লকের জাতিসংঘে পর্যবসিত হইবে। তখন একদিকে পশ্চিমা শক্তি-ব্লক অপরদিকে দুনিয়ার অপরাপর দেশ মুখোমুখি দাঁড়াইবে। জাতিসংঘের এই পরিণতি আমাদের কাহারো কাম্য নহে। কিন্তু জাতিসংঘ যদি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ নিরাপদ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য পথ কী, তাহাও আমরা খুঁজিয়া পাই না। আজ ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং এশিয়া-আফ্রিকার জনস্বার্থের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দিয়াছে তাহাতো আর বক্তৃতা-বিবৃতি বা কতকগুলি ভাল ভাল কথার অবতারণা করিয়াই মোকাবিলা করা যাইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গ্রেট ব্রিটেনও নিজ দেশে পুরা গণতান্ত্রিক; কিন্তু ইহাদের সাথে যাহারা রহিয়াছেন, তাহারা কয়জন সেই পথের অনুসারী কিংবা কয়জনই বা ঔপনিবেশিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে, তাহার হিসাব নিশ্চয়ই মিঃ কেনেডীর নিকট রহিয়াছে। সুতরাং, যে পর্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো পরিবর্তন না হয় এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরিহার করিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি সম্মত না হয়, সে পর্যন্ত 'স্বাধীন দুনিয়া' নাম ধারণ করিয়া বড়াই করিবার যেমন কিছু নাই, তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সহিত সমন্বয় বিধানেরও কোন আশা নাই। এই কেচ্ছা আমরা আর বাড়াইতে চাই না।

www.pathagar.com

নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন হইলে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃহত্তর শক্তিবর্গ কিভাবে ইন্ধন যোগাইয়া সব ওলট-পালট করিয়াছে, তার বহু নজির দুই শক্তিবর্গের আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আজিকার যে সংঘর্ষ তাহা হইল উপনিবেশবাদ ও স্বাধীনতার মধ্যে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার নীতি ঢালিয়া সাজাইতে না পারে, তবে তাহাকে স্বেচ্ছায় একটিমাত্র স্বার্থকে বাছিয়া নেওয়া উচিত। তাহা হইলে অন্তত তাহার নীতিতে কোন গোঁজামিল থাকিবে না; মানুষ স্পষ্ট ধারণায় আসিতে পারিবে। কিন্তু দুইটি বিপরীতমুখী স্বার্থের নেতৃত্ব করিতে গিয়া তাঁহারা স্ব-বিরোধী ও নীতিহীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন এবং কঙ্গো তথা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ও যে অঘটন ঘটাইতেছে, তাহার অপবাদও তাহাকে বহন করিতে হইতেছে।

কঙ্গোতে যখন বেলজিয়াম সৈন্যের উপস্থিতি ছাড়াও অন্যান্য সৈন্য অনুপ্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে পৃথকভাবে কোন প্রতিবাদ শোনা যায় নাই। কিন্তু আজ যদি ঔপনিবেশিক শক্তির হামলা হইত কঙ্গো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে কাসাব্লাঙ্কা শক্তিগুলি কঙ্গোর সাহায্যে আগাইয়া আসে, তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর ঘোষণা অনুসারে বেলজিয়াম ঔপনিবেশিক শক্তির শিখণ্ডী কাশাভুবু-শোম্বের সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য প্রেরণ করিবে। সৈন্য প্রেরণ করা না করা এবং তাহাতে বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিবার যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব বা ঝুঁকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু কঙ্গোতে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তারপর সেখানে মার্কিন সৈন্য বা পশ্চিমা সৈন্য প্রেরণ করা হইলে এশিয়া-আফ্রিকায় কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা আগেভাগে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। শুধু এশিয়া-আফ্রিকা কেন, লুমুম্বার হত্যাকাণ্ড নিয়া খোদ মার্কিন মুল্লুকে নিগ্রোদের মধ্যে কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, জাতিসংঘ ভবনে সীমাবদ্ধ বিক্ষোভ হইতে তাহা কিছুটা আঁচ করা যায়। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির যুগ যুগব্যাপী অনাচার, অত্যাচার এবং সর্বশেষে লুমুম্বার হত্যাকাণ্ড সাদা-কালো প্রশ্নকে যেভাবে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি তাহা লইয়া যে প্রচারের সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহাকে হালকাভাবে গ্রহণ করা হইলে 'স্বাধীন দুনিয়া'র পক্ষেই উহা মারাত্মক হইবে। এই সকল দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির পায়ের তলার মাটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কায়েমী স্বার্থের উন্মত্ততায় তাহা হয়তো সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হইতেছে না। সাদা-কালো বা অন্য কোন ধরনের হিংসার ভিত্তিতে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পরিণতির কথা ঔপনিবেশিক শক্তি এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদেরই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। একবার দুনিয়ার নীতির দিকে লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ঔপনিবেশিক শক্তি বিরোধী হাওয়া কোন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং কত দ্রুত তার গতি।

ইত্তেফাক, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

www.pathagar.com

পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুতে

যাঁহাদের জীবন সত্যিকারের মানব কল্যাণে উৎসর্গিত হয়, তাঁহারা মরিয়াও অমর। নেহরুর মৃত্যু এমনই একটি ঘটনা। তাই মত ও পথ নির্বিশেষে নেহরুর মৃত্যুতে আজ গোটা দুনিয়া শোকাভিভূত। এই শোকের ছায়া কাটিয়া যাইতে না যাইতেই ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতি লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। ইহাও দুনিয়ার রীতি।

মিঃ নেহরুর মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয় হইলেও তাঁহার অবর্তমানে ভারতের রাজনীতি কোন পথে প্রবাহিত হইবে, তাহা লইয়া শুধু ভারতবাসীই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সেইদিকে নজর রাখিবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মিঃ নেহরুর মত অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননেতার পরলোকগমনের পরে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে; সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তি আস্কারা লাভ করিবে; ভারতের দুর্বল নেতৃত্ব শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই ভারতকে দুর্বল করিবে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে যথেষ্ট ক্ষুণ্ন করিবে; সর্বোপরি দুর্বল নেতৃত্বের বদৌলতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে গণতন্ত্র খান খান হইয়া যাইবে। এই মুহূর্তে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিধারা সম্পর্কে কোন দৃঢ় মতবাদ ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ভারতে আজ জওয়াহেরলালের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা কিংবা তাঁহার কাছাকাছিও যে কেহ নাই, ইহা সত্য। কোন দেশেই নেহরুর মত ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব যুগ যুগের বিরল ঘটনা। এইরূপ প্রতিভা ও ক্ষণজন্মা পুরুষ হয়তো শতাব্দীতে একজন জন্মগ্রহণ করেন। তবে অন্যান্য দেশের নেতৃবর্গের মাপকাঠিতে যাচাই করা হইলে ভারতে এখনও প্রথম কাতারের নেতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। বটবৃক্ষ সমতুল্য নেহরু-নেতৃত্বের ছত্রচ্ছায়ায় যে সকল নেতা এতদিন জনগণের দৃষ্টিতে পড়েন নাই, আজ নেহরুর পরলোকগমনের পরে হয়তো তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগ্য নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটিবে। আজিকার দুনিয়ায় বহু দেশেই-এমনকি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিতে পর্যন্ত সাধারণ স্তরের নেতৃত্ব চলিয়াছে। বস্তুত, গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় দলীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। সেখানে দলীয় সংগঠন, কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট দলের জনপ্রিয়তাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের কংগ্রেস দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। সুতরাং শাসন ব্যবস্থায় সঙ্কট কিংবা বিপর্যয় দেখা দিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বিরোধ রহিয়াছে। এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ বর্তমানে কি আকার ধারণ করিবে, তাহাই বিশেষ লক্ষণীয়। কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীরা এখনও বিশেষ প্রভাবশালী। মোরারজী দেশাই, পাতিল, কৃষ্ণমেনন, মালব্য প্রমুখ বামপন্থীকে মন্ত্রিত্ব হইতে বিতাড়ন করা হইয়াছিল। জওয়াহেরলাল কামরাজ প্ল্যানের সুযোগে এই চরমপন্থীদেরও মন্ত্রিত্ব হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই নেহরুর পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা মধ্যপন্থীদের মন্ত্রিসভা বলিয়া পরিগণিত হইত। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিঃ গুলজারীলাল নন্দ পুরোপুরি বামপন্থী না হইলেও একজন মধ্যপন্থী তো বটেই। কিন্তু নেহরুর পরলোকগমনের পর দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা দখলের জন্য যে বিশেষ তৎপর হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মোরারজী দেশাই-এর মত চরমপন্থীরা ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হইলে তাহা শুধু ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষেই অকল্যাণকর হইবে না, বিশ্বশান্তির পক্ষেও অশুভ হইবে বলিয়া অনেকের আশঙ্কা। চীনের সহিত সংঘর্ষ সত্ত্বেও মিঃ নেহরু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ইহারই ফলে এশিয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। কিন্তু মোরারজী দেশাই প্রমুখ সোজাসুজি ব্লক বিশেষের সহিত যোগদান করিবার পক্ষপাতী বলিয়া অনেকের ধারণা। এমতাবস্থায় রাশিয়াসহ কম্যুনিস্ট ব্লকের সহিত এই অঞ্চলের সংঘর্ষ— তথা স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। তাহা ছাড়াও ভারতের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায়ও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা না দিয়া পারে না। চরমপন্থীদের শাসনামলে ভারতে যে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা এতদিন সযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহা রক্ষিত হইবে কি না সন্দেহ। চরম দক্ষিণপন্থীদের শাসনের অর্থ হইবে ভূস্বামী, পুঁজিপতি এবং আমলাতন্ত্রের প্রভাবান্বিত শাসন। এই ধরনের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থী প্রভাবিত শাসন-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার স্থান থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়ত কায়েমী স্বার্থী প্রভাবান্বিত শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তি আস্কারা লাভ করিবে। কারণ জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতের কায়েমী স্বার্থীরা ও তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করিবে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা জিয়াইয়া রাখিতে চাহিবে। এমতাবস্থায় ভারতের পাঁচ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমান নিরাপত্তাবোধ হারাইয়া ফেলিবে। প্রধানত সংখ্যালঘুদের কারণেই ভারতে কোন্ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে, সে সম্পর্কে আমরা বিশেষ আগ্রহী। ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হস্তে গান্ধী জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, জওয়াহেরলাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার সকল প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব লইয়া সাহসিকতার সহিত এই অশুভ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, তথাপি দাঙ্গাবাজদের সাফল্যজনকভাবে মোকাবিলা করিতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে যে কায়েমী স্বার্থীদের হাত থাকে তাহা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের এখানেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারকালে দেখিয়াছি যে, মুষ্টিমেয় মানবতাবিরোধী ও কায়েমী স্বার্থীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করা কঠিন

www.pathagar.com

ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। মানবতার প্রশ্ন বাদ দিয়াও যখন আমরা সংখ্যা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, পাকিস্তান হইতে এক কোটি সংখ্যালঘু চলিয়া গেলে, ভারতের পাঁচ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানের জীবন বিপন্ন হইবে; তাহাদেরকে ভারত হইতে বিতাড়ন করিবে। তখনও এই মানবরূপী দানবেরা সহজে নিরস্ত হয় নাই। ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নেহরুর জীবদ্দশাতেই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবি তুলিয়াছিল। তাহারা সম্প্রতি প্রকাশ্যে বলিয়াছে যে, পাকিস্তানের এক কোটি সংখ্যালঘুকে গ্রহণ করিয়া তাহারা ভারত হইতে পাঁচ কোটি সংখ্যালঘুকে বিতাড়ন করিবে। তাহাদের দুষ্ট প্রচারণার দ্বারা তাহারা গোটা ভারতকে বিপথগামী করিতে না পারিলেও বহুলোককে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিল— যাহার ফলে শুধু ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলিই নয়, অসাম্প্রদায়িক কোন কোন রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল লোককে ভারতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব দিয়াছিল এবং এখনও দিতেছে। একমাত্র জওয়াহেরলালের দৃঢ়তার দরুনই এ পরিকল্পনা এ পর্যন্ত সফল হইতে পারে নাই। আজ জওয়াহেরলালের অবর্তমানে কে ভারতের এ অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখিবে, তাহাই আমাদের চিন্তার ব্যাপার। যাহারা মনে করেন যে, ভারতে দুর্বল নেতৃত্বের আবির্ভাব হইলে ভারত ধ্বংস হইবে, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নই। এযুগে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধ্বংস হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ভারতে দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় নীতি বরং কঠোর হইবে এবং সেই দুর্বল নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিকে রুখিয়া দাঁড়ান দূরের কথা, বরং প্রশ্রয় দিবে। দুর্বল নেতৃত্বে শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়। মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিতে চায়। তাই আমাদের কামনা যে, ভারতে এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক-যাহারা অন্তত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দিবেন না, কিংবা যুদ্ধবাজদের এই অঞ্চলে ঠাঁই পাইতেও দিবেন না। তাহা হইলে পাক-ভারত উপমহাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যা-এমনকি কাশ্মীর সমস্যাও শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

ইত্তেফাক, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩

www.pathagar.com

In Memory of Huseyn Shaheed Suhrawardy

Today we mourn the death of Huseyn Shaheed Suhrawardy, one of the architects of Pakistan. He lived and died for upholding values in politics. He all along adhered to the principles of democracy and fought for these ideals till his end came, away from his home, away from his people, four years ago, this day, the 5th December, when he breathed his last under tragic circumstances in Beirut.

We adore him for his democratic beliefs and struggles, we salute him for the sufferings, he underwent for the cause of democracy and for the welfare of the people. But unfortunately our adoration of the great leader seems to have turned into a mere ceremony, without the understanding which the occasion calls for. We swear allegiance to him but hardly follow his example, the line he chalked out for the attainment of the objectives. We all profess to dedicate ourselves to the cause of democracy but how many of us would put service above self; how many among us are genuinely concerned about the real welfare of the people? Our house is divided; we hardly tolerate each other; some of us think, may be honestly, that one can deliver the goods all by oneself. Those who disagree are branded self-seekers and reactionaries. Of course, we still have many who are making tremendous sacrifices. Our younger generation is holding the banner high against heavy odds. We admire them. A large

www.pathagar.com

number of political leaders and workers, including many students, have been rotting in jails. If our heart bleeds today, it is simply natural.

Those who think that the situation we are in today will lead to the solution of political problems or any problem for that matter or silence the voice of the people, are mistaken. These days we find that many present themselves as friends of the Bengalee Muslims. We always welcome a sincere gesture of friendship. But that would not wipe out from our memory the names of our great heroes— Sher-e-Bangla Fazlul Haq and Huseyn Shaheed Suhrawardy. They stood by the Bengalee Muslims like a rock, when there was none to look after them, none to extend them a helping hand, none to give them a sense of direction, faith in themselves and determination to forge ahead.

These great men organized the Bengalee Muslims; courageously and relentlessly worked for their uplift in all walks of life, and finally put them on the road where we find them today. Khawaja Nazimuddin was another of our leaders who, in his own way, gave basic service to the people. The way the Debt Settlement Board, Money Lender's Act and Bengal Tenancy Act were amended to give succour and relief to the teeming peasantry of Bengal, who remained in debt right upto their neck, will keep the names of their leaders fresh in our memory and in the memory of our children's children till eternity. It was under the leadership of Fazlul Haq and Shaheed Suhrawardy that the Bengalee Muslims could get an upper hand in the socio-economic and power-structures of undivided Bengal.

www.pathagar.com

I have no intention on this occasion to raise issues against our politicians. On the contrary, all my sympathies are with those who have suffered and are still suffering for the cause of democracy, and for ensuring justice to the people. But what one has to look into is whether some of us are putting the cart before the horse, thereby thwarting the natural process of growth and success. We should bear in mind that politics is an art of achieving the possible.

I am aware of the frustration and bitterness among our younger generation. The youth do not share our generation's way of thinking and approach to problems. They consider us outdated. I know why they are impatient. We are declining into old age. They have yet to start their days. They see darkness all around. We have done precious little to give them light. They have seen political discriminationa and economic exploitationa ever since they opened their eyes. The old guards are either gone, or those who are left belong to different schools of thought. They are too undecided to adjust themselves and march with the time. Their leadership does not appear to attract the younger generation, although they are the only remnants of our freedom fighters and indeed these dozen or so people are the last link between the two wings.

Some people often say that there is a secessionist movement in East Pakistan and warn us about its consequences for East Pakistan. We are told that if East Pakistan secedes it will be swallowed by India, that we shall lose our freedom. They point out that West Pakistanis, who are fighters, can survive and maintain their independence and sovereignty.

www.pathagar.com

I do not believe in such things, nor do I know if any responsible person in East Pakistan thinks in terms of secession. Why should we secede? It was Bengal that played the most prominent and decisive role in the Pakistan Movement. East Pakistan contains the majority of the populaton of Pakistan. The charge of harbouring secessionist intentions is thrust on us only to hang us. The vested interests which have been controlling our political and economic destiny ever since the establishment of Pakistan, have always been fabricating various pretexts to create suspicion and disunity among the people of the two wings so as to carry on their exploitaion more intensively and extensively.

The first pretext was that East Pakistan had no absorbing capacity and that is why there was less development in East Pakistan. True, at the initial stage East Pakistan did not have many functionaries and technicians. That gap was filled, from the very beginning, by men from West Pakistan, and optees from India. With all devotion and sincerity, which the situation demanded, the development of this wing should have begun at the same rate and speed as that of West Pakistan. There was really nothing to stand in the way. Still strange and untenable is the fact that when East Pakistan itself filled the gap the disparity even now should keep on widening. True, more money is being pumped in now-a-days for development, but unless the development pattern is changed it could hardly bring relief and prosperity to the people, what to speak of removing the disparity between the two wings.

www.pathagar.com

As for the defence of the country, we were told that the Bengalees were not a martial race, and as such, they were not fit to get their due representation in the country's armed forces. It is not known whether this canard was borrowed from the British who, for obvious reasons, could not use the Bengalees for the then Indian Army to uphold the British rule in India. It is unfortunate that even after the creation of Pakistan this alien outlook did not change.

The 1965 September war, however, came, in a way, as a blessing for us. The Bengalee officers and jawans in the Pakistan Army proved their mettle, and the entire nation, including the generals, most of them from West Pakistan, had nothing but unreserved praise for the valour, courage and fighting qualities of the Bengalee troops at the Lahore, Badian and other sectors. When all the excuses have been exploded, the vested interests are continuously poisoning the ears of our West Pakistani brethren and those in power by insisting, come what may, that in fact, East Pakistan wants to secede. Apparently their intention is to create bad blood among the people of the two wings.

These shortsighted elements do not realise the consequences that may follow from such propaganda. I have heard from some West Pakistani friends that these vested interests at times go so far as to say that East Pakistan is nothing but a cancer in the body politic of Pakistan, and it would be good to get rid of that cancer. These elements, unmindful of the very integrity of the country, nourish the fond hope that if East Pakistan secedes, or is thrown out, whatever is the case, they can merrily hold their own with the particular socio-economic pattern of West Pakistan.

www.pathagar.com

I want to caution all concerned against the grave danger inherent in this type of propaganda. The idea of secession should not be put into the head of our younger generation. I reiterate that East Pakistanis do not want to secede; they only want the injustices and oppression to stop, and their due rights restored to them. They want to live together as brothers and as equal partners in the affairs and management of the country. The people of East Pakistan are thus opposed to any dispensation which will make one wing a master of the other. This is precisely the reason why they accepted parity though they were and are in a majority. They believe that political problems must be faced and tackled at the political level, and not by coercion and suppression.

I have stated these facts repeatedly even at the risk of being misunderstood. I did so just on the eve of my arrest, seizure of Ittefaq and sealing of all my press in June 1966. In a free democratic society, which we visualize, and are struggling to achieve, it is only natural to have divergent views and different programmes. It is advisable to thrash them out at the bar of public opinion. We believe that the strength of Pakistan, in fact, its very existence, depends on the goodwill and mutual respect among the leaders and people of the two wings.

This is what our great leader Shaheed Suhrawardy taught us, and himself practised scrupulously all his life. In this connection it will not be out of place to mention an event. After his release from jail in 1962, Mr. Suhrawardy was touring and holding public meetings at different places in West Pakistan. He was accompanied by a number of opposition leaders from East Pakistan. At Gujranwala

www.pathagar.com

railway station an attempt was made on his life when a shot was fired at him (September 27, 1962). God saved him and he was not the least ruffled, but his followers from East Pakistan were greatly perturbed and agitated over that ghastly attempt and urged him not to undertake any further tour of West Pakistan. But at his first public meeting at the Paltan Maidan he exhorted the people not to get excited over the mad venture of a mad individual. He emphasized that the people of West Pakistan could not and should not be held responsible for that. At the same time he narrated before the audience how thousands of people turned up at different places in West Pakistan to greet and hear him and those who had come from East Pakistan. He told the audience that the masses in West Pakistan were as poor, if not worse, as East Pakistan's teeming millions and that certain areas in West Pakistan were no less under-developed than what we see in East Pakistan.

My own experience about it deserves a reference; just after the cease-fire in the Sptember war, I visited several places in West Pakistan. I was deeply moved to see the vast slum areas in Peshawar, Kohat and around other centres, and the deplorable living conditions of the general mass of people just within and outside the highly developed areas. Our struggle is against the vested interests, not against West Pakistan, certainly not against our West Pakistani brethren. Our goal is a truly democratic and welfare state, drawing strength from absolute equality and understanding between the two wings.

Those who imagine, that if East Pakistan secedes West Pakistan can still survive, are no good students of history, nor are they fully aware of the unchallengeable realities of

www.pathagar.com

merciless time and environment. Even a cursory glance would show the fallacy of such fantastic thinking. East Pakistan consists of a homogenous people, speaking one language and wedded to the same culture. But West Pakistan presents a different picture. It has divergent communities of people, such as Punjabi, Pathan, Baluch and Sindhi, not to speak of the tribes. They speak their separate languages, and take pride in their separate cultures, so markedly different from each other. Incidentally, Urdu is the mother tongue of only three percent of its population. God forbid, if Pakistan is dismembered, what will hold together West Pakistan with its so many distinct linguistic and cutural groups, not always seeing eye to eye, with each other?

We have to stay together for our mutual survival, strength and prosperity. But this is no one-way affair. And they should realise that the West is no less vulnerable than the East, rather more.

I maintain that all concerned should pause and ponder. No doubt we are facing a crisis in the matter of national integration. We are facing a crisis of conscience. We are losing faith in each other. And this is the greatest danger to the cause of integration, geographically, linguistically and otherwise. Pakistan appears a strange phenomenon. But it was by free choice that we succeeded in carving out this country, and we mean to make it stay and mean it to grow from strength to strength. It was in this spirit that we could solve the language problem by adopting Bengali and Urdu as two state languages. We have inherited different cultures. But our unity lies on diversity. Let us not forget that culture grows from within, and is never made to order.

www.pathagar.com

Our standing shame is that in twenty years we have not been able to solve our political problems, particularly that of national integration. Where the fault lies, and who is responsible for this? Our demand for regional autonomy is a geographical, economic and defence necessity. We believe that Pakistan can be stable and strong only when its two wings enjoy equal rights and development. This would remove fear and hatred, and give way to love and respect for each other. By concentrating all the power at one place we would ultimately be nowhere. It is my honest feeling that too much concentration of power in one place is at the root of bitter regionalism as we see it today. I entreat all concerned to relax and let us blend all our energies to restore mutual trust and confidence. Once we succeed in removing the distrust and misunderstanding, we will find things smooth. After all, people do not want to make Pakistan weak.

I am an optimist and believe in the destiny of the people. We have a debt towards history, which is, however, never kept without suffering. The sufferings of our people cannot go in vain. Oppression and suppression are not the final words. We have to pay more price because what we paid for Pakistan was inadequate. True, thousands and thousands of people laid down their lives, gave all they had and many more were rendered homeless in the wake of partition. Equally true is the fact that most of the top leaders had no sacrife to their credit. On the contrary, they prove utterly selfish, and for their own aggrandisement made capital of the sufferings of the common people. It seems, we have to pay for their sins.

The Pakistan Observer, December, 5, 1967.

www.pathagar.com

Developing Politics In Pakistan

Today is the death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy. Five years ago this day he breathed his last, in a foreign land away from his kith and kin, away from the vast mass of his followers and his countrymen for whose freedom and welfare he lived and struggled all his life. His end came amidst circumstances too tragic for words.

Huseyn Shaheed Suhrawardy died as a brokenhearted man, a dejected leader and statesman, who combined in himself the rare gift of idealism and realism. His dejection arose not because he was jailed without trial in his advanced age, not because of the unbecoming treatment he so often received from men in power, but because of what I may call 'developing politics,' and the drama that was being staged from time to time almost in every section of the nation's life. As one being so close to him I knew what was worrying him most, and what largely contributed to his indifference to his health with the passing of time, was the shattering of his ideals, and those fundamentals on which he was never prepared to compromise. He was keenly distressed by whatever was happening around him. In his utter bewilderment, he once told me : "What can anyone expect when attempts are made to torpedo the very foundation of a structure?" While others were either busy feathering their own nests, or whiling away their time and thought in complacency, Mr Suhrawardy was horrified to see the writing in the wall. His fears are well in focus now.

www.pathagar.com

Today, we are observing Mr. Suhrawrdy's fifth death anniversary in an extremely disquieting background.

The regime says that everything is all right in the country. But what about the current wave of unrest throughout West Pakistan, more particularly in Rawalpindi, the citadel of all strength and power of the present regime? What about 'the storming' of that region by Mr Zulfikar Ali Bhutto, now in detention under the D.P.R? I do not want to touch upon the student issue at the moment, but about the demonstrations held, or being held, by eminent lawyers, from one end of the country to the other? What about the recent public statements of no less a person than the former chief of the Pakistan Air Force, Air Marshal Asghar Khan? Mr Bhutto, presented by the regime all the time as a dynamic Foreign Minister, relentlessly campaigning against India and ready to fight India for a thousand years, is now branded by that very ruling circle as an Indian lackey!

The plain truth is that the whole country is restive today and men of vision genuinely feel as if we are all sitting over the crater of a simmering volcano. Unless those who matter, dispassionately go into the 'why' of it, and in the light of this heart-searching and revealing inquiry, determined steps are taken to remove the 'causes', the future is uncertain. Facts that are not frankly faced have a habit of stabbing us in the back, and no where in the world a mere word-painting had prevented the revenge of history.

However, I am making an attempt briefly to go into some of the 'whys' of the country's present convulsion. To start with, Pakistan came into being as unique country; some called it a geographical freak. One has yet to find a parallel, where a country found itself divided into two distinct parts; one separated from the other by fifteen hundred miles of

www.pathagar.com

foreign territory. And then the capital was located in the western wing and with that, the immediate concentration of real power and wealth. And this kept on expanding steadily. The bonds of Islam have their own attraction. But they can hardly be the last word where the factors influencing the other human considerations and interests are too many and too formidable.

It is no good dilating on the cultural and other differences among the people of the two wings. My point is that what made the people of East Pakistan accept the vast gap between East and West Pakistan was their hope that they would get an equal and effective share of power and wealth, and that in course of time, all kinds of disparity would go. But unfortunately that hope never came true.

We sincerely believe that East Pakistan's hope could be materialized only in a system of parliamentary democracy drawing its strength from the will of the people, justice and fair-play. And this is precisely that it was never allowed to grow to take its firm roots. Democracy, as Mr Suhrawardy repeatedly pointed out, did not fail in Pakistan. But the fact is that democracy was scarcely given a fair trial. The Muslim League which had launched the Pakistan Movement died no sooner than the movement turned into a hard reality. The Pakistani edition of the Muslim League lost touch with the masses. Power passed into the hands of the British trained bureaucracy, when East Pakistanis had no representation and had also no say worth the name. Only those politicians were 'acceptable' to the iron ring of the civil service who could listen to the 'advice' of the bureaucrats, and thus play the role of their frontmen. The moment any politician, holding a ministerial office or such other state assignments, tried to show independence of judgement or tried to assert himself,

www.pathagar.com

was thrown out, and in many cases tied with a ready-made catalogue of his 'misdeeds.' In East Pakistan, we had a chief secreatary who publicly confessed with an air of superiority, that he was maintaining secret files about the Ministers. Some of the bureaucrats thought as if they were the successors of the Moghul Emperors!

Whatever prestige and pull the politicians had in the affairs of the state vanished with the assassination of Mr Liaquat Ali Khan who himself was not very tolerant of political opposition in the country. After him, Pakistan virtually became a dominion of the bureaucrats, and the Big Money consolidation its grip. The 1956 constitution framed and launched with so much of difficulty, could keep a check on the bureaucracy had the constitution stayed and worked the way it was intended. When Mr. Suhrawardy formed his Government the general mass of people, particularly in East Pakistan, felt that it was the beginning of better days for them, and the country as a whole, since Mr. Suhrawardy firmly believed in social, economic and political justice, and as Prime Minister, he was directing his efforts towards reviving the glorious traditions of democracy, where the people ruled through their accredited representatives. But the bureaucrats were so strong and hostile that Mr. Suhrawardy had to quit. The only hope then left was that after the general election scheduled for 1958-59, the situation would improve and East Pakistan would find its rightful place in national affairs.

But that hope was also crushed when Martial Law was imposed while the preparation for the general election had entered the final stage and tentative election date was fixed. Martial Law first came in the name of Mr Iskander Mirza and

www.pathagar.com

ironically he himself was one of its major casualties. Twenty days after declaration of Martial Law, he was bundled out and succeeded by General Ayub Khan. Anyway, Martial Law buried not only whatever democracy was left in the country but also brought to the fact that real and effective power lay with the Army or the Armed forces. Since the Army could not be kept for long in the political field for obvious reasons, the bureaucracy was brought back into the picture but with a difference. This time, they were required to play second fiddle. But are the bureaucrats really playing second fiddle, and occupying the proverbial musical chair, or are they engaged in the same clique that brought about the downfall of successive political governments?

In the beginning, the protagonists of Martial Law expressed their abhorrence of the slightest mention of 'politics' and political parties. But they did not have to wait very long to realise the need for some sort of a party to save their ends. Martial Law was thus 'repealed' and was replaced by the constitution promulgated by Field Marshal Mohammad Ayub Khan in March, 1962. The Basic Democracy system was promulgated and a bill was passed permitting the revival of political parties. The ruling group formed what is called Convention Muslim League at Clifton, Karachi. The Muslim League, which ultimately passed into the direct and absolute command of President Ayub, was left with no other job but to organize all-out mobilization from the side of the civil servants. From this wing recruits consisted generally of those rejected people who were defeated in the 1954 elections.

But what vitally concerns the people, who have been deprived of all their fundamental democratic rights—a fact which has been agitating their minds since long—is the 'philosophy' governing the present constitution, the B.D.

www.pathagar.com

system, the electoral colleges, the 'emergency powers', and the administrative machinery. It is wellknown that we are opposed to the novel B.D. system as it does not reflect the will of the people.

But the rulers call it electoral college. I do not know what would have been the public reaction to the B.D. system if it had been a purely electoral college in expanded from free of administrative control or like the American electoral college system. But the B.D. system we have is nothing but the extension of the lower strata of government department bound hand and foot under the wheels of bureaucratic machinery and it is bureaucracy which practically controls these 'voters' and runs the elections.

A constitution grows from within, with public confidence, trust, respect and support. Anything imposed, especially when the act of imposition lacks sincerity of purpose, carries the seed of its own destruction.

President Ayub's constitution, and all its products and byproducts, such as the National and Provincial Asemblies– not to speak of the B.Ds who have to spring from the 'grass roots' have failed to provide any genuine political and emotional link between the government and the people. In his constitution, the President has extended 'official recognition' to the opposition. But it is foreign consumption. Has it any meaning for the growth of healthy politics in our country?

Another crucial point is that the present constitution has no dependable and trustworthy provision for a smooth 'succession' not even for filling occasional vacancies. None acted as 'President' when President Ayub was seriously ill for so many weeks. Why and what does it show? In one of his recent speeches, Air Marshal Asghar Khan strongly criticised the violation of the relevant Provisions in this respect by the

www.pathagar.com

government and regretted that President Ayub's constitution should have languished in his life time. Till the time of writing this article, none of the Government spokesmen had come out to 'contradict' the Air Marshal as they did very promptly in the case of Mr Nurul Amin, when he pointed to the same failure a few months ago. Perhaps, they made a distinction between what is said by a politician and what is said by a soldier.

Coming to the 'forms' of Government, the Presidential one, even without the crude B.D. tapestry, is not acceptable to the people. The people do not just like the Presidential System, for, under this system, all the powers, political and economic, will continue to remain in and operate from West Pakistan. Those who are pleading for the Presidential System, willingly or otherwise, do not pay any regard to the will of the people. East Pakisan stands, and firmly for the Parliamentary System based on adult franchise, where not only power is fairly and effectively distributed between the two wings and different regions, but also where high and key offices under the state go to different areas by rotation, so as to give a really nationwide sense of participation.

It is gratifying that Air Marshal Asghar Khan, and some top West Pakistani leaders like Mr Mumtaz Daultana appear sincerely to realise the colossal injustices done to East Pakistan in every field of national significance under the bureaucratic rule and the President's Presidential system. Statements publicly made by our friends in West Pakistan, on the subject, especially the brief but forthright review of the situation since 1951, by Air Marshal Asghar Khan, come as a silver lining in the thick and dark clouds around us. I have always held that the leaders of public opinion in West Pakistan must rise in protest against the injustice done

www.pathagar.com

towards East Pakistan. And this will serve the cause of national integration more than exchange of non-descript persons between the two wings at huge public costs.

East Pakistanis are not parochial, not self-centred, and never unaccommodating. If the case would have been otherwise, we would not have readily accepted the principles of parity. No East Pakistani worth his salt wants to secede.

Our stand is simple. We believe in give and take, and our watchword is oneness with equity. We mean to contribute to the building of a society and a brotherhood where every Pakistani, either from the East or from the West, is genuinely inspired that he is as much a part of that society and that brotherhood as the other is. Both the wings should be given to feel that they have equal share in power and the administration of the country. This is our stand.

I have given utmost thought to the problems the country is facing. It is still my hope that good sense will prevail over the power that be and President Ayub will release all political prisoners, restore democracy and freedom to the people and thereby create a sense of participation and pride in our people. A frustrated, moribund, divided nation as we are today, can't survive long, far less march ahead.

Pakistan Observer, December 5, 1968.

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) আমাদের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র জগতের এক প্রবাদপুরুষ। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ইত্তেফাকের পাতায় 'মুসাফির' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লিখে তিনি দুর্লভ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর কালের রাজনৈতিক দৃশ্যপট উন্মোচনে যে গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখেন, সাধরণ মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধের পরিচয় দেন এবং সত্য ভাষণে যে অমিত সাহস দেখান তার তুলনা মেলা ভার। বস্তুত তার হাতেই নির্মিত হয়েছে আমাদের সমালোচনামূলক এবং প্রতিবাদী সাংবাদিকতার সুমহান ঐতিহ্য।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই কৃতি-পুরুষ লোকান্তরিত হন ১৯৬৯ সালের ১লা জুন। এরপর আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতন সংগঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জন এবং সেই স্বাধীনতাকে জনজীবনে অর্থবহ করার সংগ্রামে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে এই জাতি। রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা আজও পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়নি। তাই মানিক মিয়ার লেখনীর আবেদন আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বরং সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো সাংবাদিকের ক্ষুরধার লেখনীর প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। এই অনুভবই আমাদের অনুপ্রাণিত করে তাঁর লেখাকে গ্রন্থাকারে পাঠকের কাছে হাজির করতে।

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) 'মুসাফির' ছদ্মনামে শুধু রাজনৈতিক মঞ্চই লেখেননি, স্বনামে অনেক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ভিন্নতর প্রকাশভঙ্গি লাভ করেছে। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' যে চিন্তা-চেতনা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে শাণিত, নিবন্ধ ও ভাষণে তা যুক্তি ও মননে সংহত। তাঁর মানসলোককে পুরোপুরি উপলব্ধির জন্য এসব ভাষণ ও নিবন্ধের সঙ্গে আজকের পাঠকের সম্যক পরিচয় থাকা আবশ্যক। মানিক মিয়ার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো একটি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা ব্যতীত তেমন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় সংস্করণে বইটির নাম রাখা হয়েছে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'। বইটি মুদ্রণ প্রমাদমুক্ত করার ব্যাপারে মোঃ সাইদুর রহমান সাহেব আমাদেরকে মূল্যবান সাহায্য করেছেন। আর 'ইতিহাসের মতো গতিশীল জীবনের দু'টো অধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশের সময় সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর তার সংগ্রহ থেকে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রকাশ করতে এগিয়ে আসার জন্যে 'মিজান পাবলিশার্স' সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ তোশারফ আলী

২৬ জানুয়ারি ২০০৫

ISBN 984 8613 02-1